মধুচন্দ্রিমা

জামেদ আলী

মধুচন্দ্রিমা

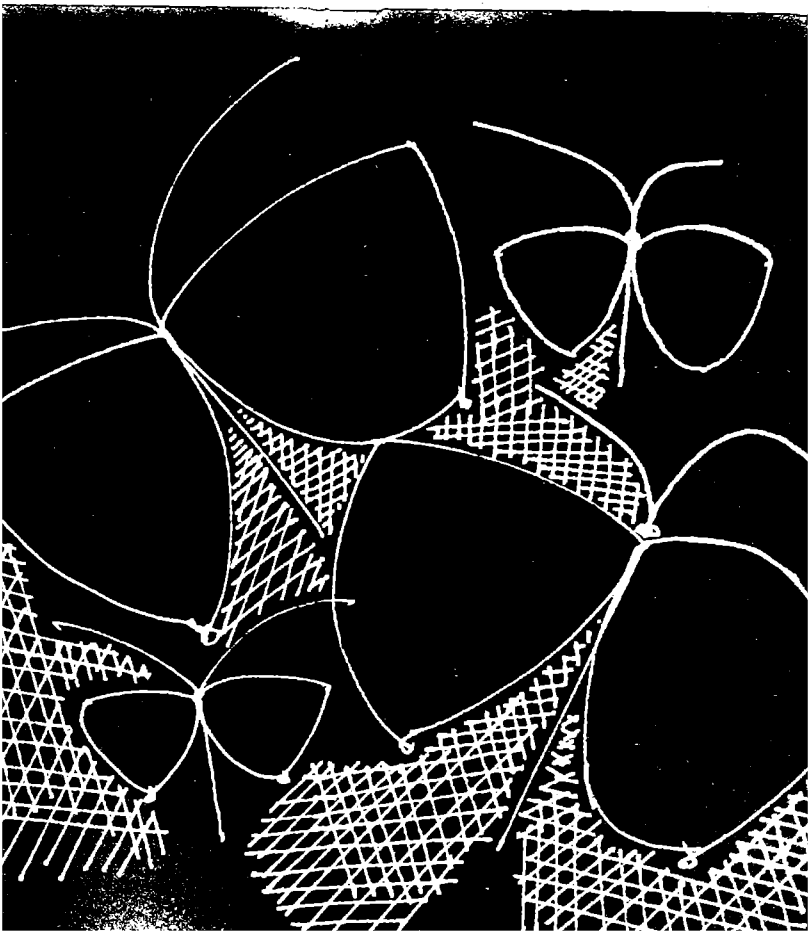

www.pathagar.com

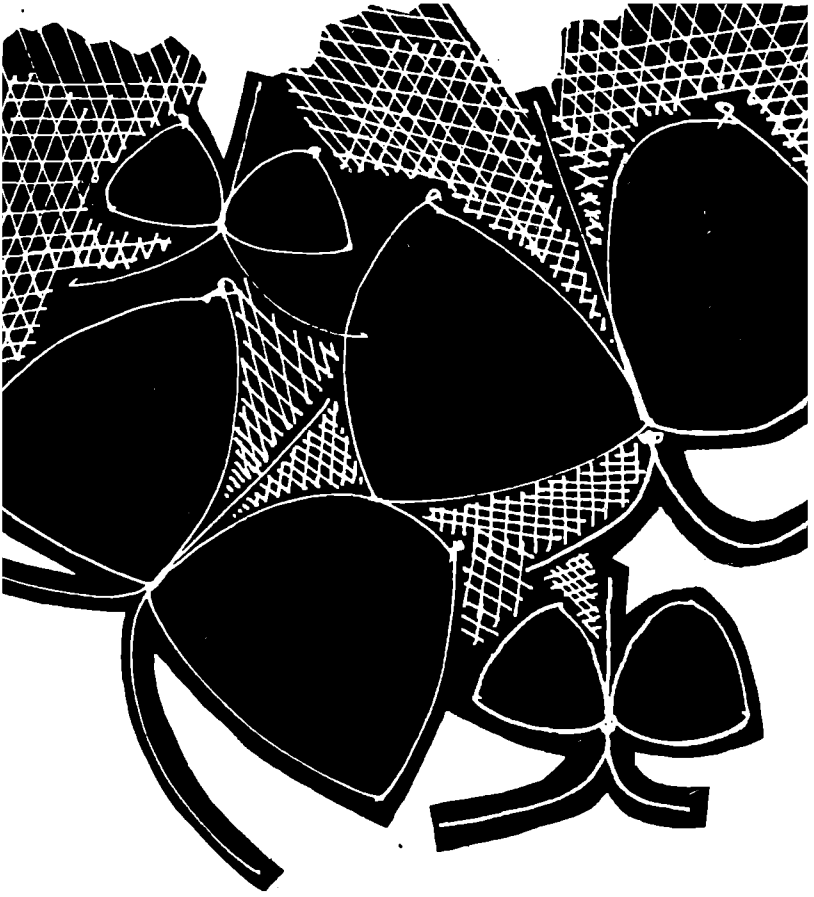

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

মধুচন্দ্রিমা

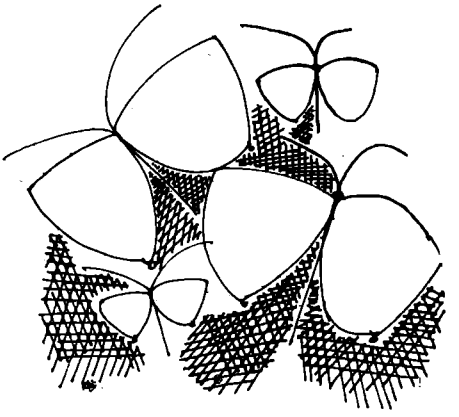

জামেদ আলী

www.pathagar.com

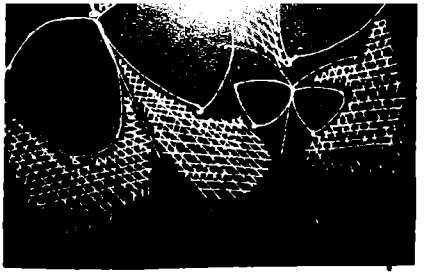

মধুচন্দ্রিমা
জামেদ আলী

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বাসাপত্র-২৭

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৯১
আশ্বিন ১৩৯৮

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ
আশা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, ঢাকা

মুদ্রণ
ইছামতি অফসেট প্রেস, ঢাকা

মূল্য
ষাট টাকা (সাদা)
পঁয়তাল্লিশ টাকা (নিউজ)

Modhuchandrima: A Collection of short stories by Jamed Ali
Published by Abdul Mannan Talib. Director, Bangla Shahitta Parishad. 171, Bara Maghbazar. Dhaka-1217
Price: Tk: 60.00 (White) Tk: 45.00 (news)

www.pathagar.com

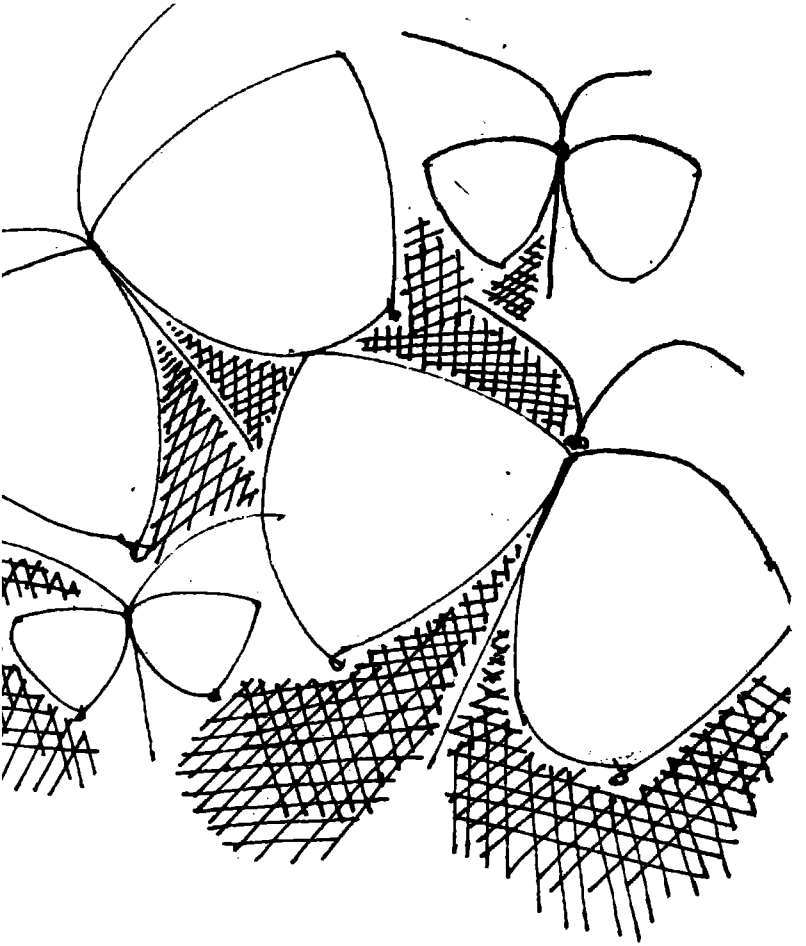

মাহবুবুল হক
অভিন্ন হৃদয়েষু

www.pathagar.com

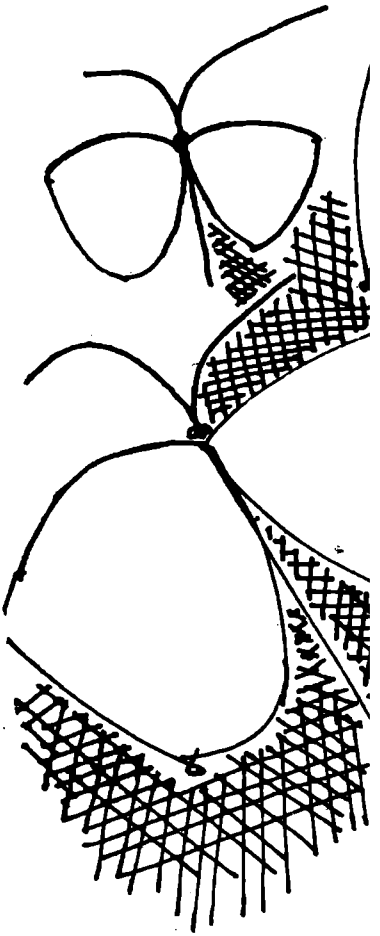

লেখকের অন্যান্য বই

অরণ্যে অরুণোদয়	(উপন্যাস)
মেঘলামতীর দেশ	(উপন্যাস)
মুনীরা	(উপন্যাস)
লাল শাড়ী	(উপন্যাস)
গোধূলিতে	(গল্প গ্রন্থ)

www.pathagar.com

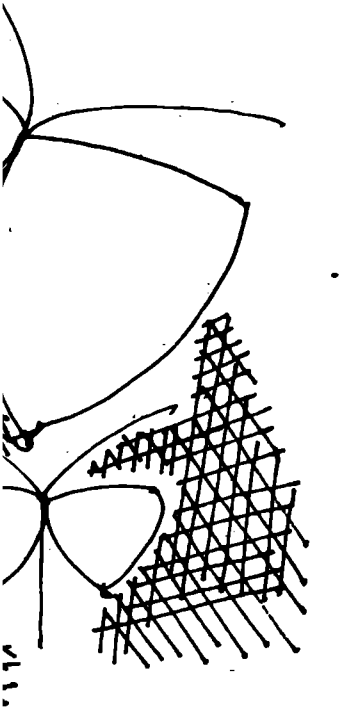

গল্প সূচী

অপরাজিতা ৯
রঙ্গিন ফানুস২০
মধুচন্দ্রিমা ৪০
স্বপ্ন ৫৩
চরিত্রবতী ৬৬
ফসল ৭৪
শরাফত আলীর ব্যবসা ৮৩
উত্তরাধিকার ৯৬
উৎকণ্ঠা ১০৩
বিপরীত প্রত্যয় ১১৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অপরাজিতা

শাদা বরফের আস্তরণে ঢাকা আলশিরের ঢালু উপত্যকা। চড়াই-উৎরাই আকীর্ণ এ উপত্যকায় রোদের খেলা বড়ই মনোরম। সূর্য মুখ তুললেই নির্মল আলোকে বরফের বিস্তীর্ণ ঢালু প্রান্তর দুধের মত শাদা ধবধব করে। খানেওয়াল থেকে মনে হয় দূরে-বহুদূরে খুব বড় একটা রূপোর পাত সারাটা ঢালু জুড়ে বুক চিতিয়ে পড়ে আছে। সূর্য যত উপরে ওঠে, ঝিলিমিলিটাও ততই মনোরম লাগে । আর ঐ মনোরম দৃশ্যময় ঢালুর উত্তরে শ্বেত ভল্লুক বাসা বেধেঁছে উপত্যকার পাঁচ কিলোমিটার দূরে, সমতল জুড়ে। হিংস্র থাবায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে খানেওয়ালের শান্ত জনপদ আর সবুজ-শ্যামল আপেল-আঙ্গুরের বাগান।

শামশাদ বানু খানেওয়ালের চৌকস তরুণী। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ-করা, দীর্ঘদেহী, সুন্দরী শামশাদ সারা তল্লাটে মশহুর। ওর বাপ গুল মোহাম্মদ খান রিটায়ার্ড সিভিল সার্ভেন্ট। বড় ভাই ইমতিয়াজ খলিল পাকিস্তান থেকে পাশ করা ইলেকট্রিক্যাল ইন্‌জিনিয়ার আর ছোট ভাই ইব্রাহিম খলিল পদার্থ বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র। শামশাদের মা ফাতেমা বানু সমাজকর্মী ও বিদূষী মহিলা। সব মিলিয়ে একটা শান্তির নীড় শামশাদ বানুদের। কচি আঙ্গুর পাতার মত সবুজ, মসৃণ আর মায়া-সুনিবিড় সংসার। দু'ভাই আর এক বোন। বাপ-মায়ের স্নেহের দুলালী শামশাদ বানু।

আলশিরের ঢালু প্রান্তর গড়িয়ে, চক-চাঁদিনীর নালা বেয়ে বরফগলা পানি খরস্রোতে নেমে আসছে খানেওয়ালে। স্ফটিক স্বচ্ছ পানি খানেওয়ালের সঞ্জীবনী সুধা। ফলের বাগিচা, ফুলের নিকুঞ্জ ঝকমক করে হেসে ওঠে আলশিরের বরফ গলা পানির ছোঁয়ায়। মাথার ওপর ঝুঁকে পড়া আপেল গাছের ডালে অসংখ্য সুমিষ্ট ফল ঝুলে আছে। গাছের তলায় টেবিল-চেয়ার পেতে শামশাদ বানু আর তার বাপ-মা দেশের কথাবার্তায় মগ্ন। কনকনে হিমেল সকালে চা-নাশতা প্রস্তুত । বড় একটা বারকোষে ভেড়ার একটা আস্ত রানের রোষ্ট। সাথে লবণ-গোল মরিচের গুঁড়ো। টী-পটে ফিকে চা আর ছোট একটা প্লেটে চার ফালি করে কাটা কিছু টাটকা আপেল।

এমন সময় কাবুল থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে উড়ে আসা রুশ এম,আই,জি,বোমা ফেলল খানেওয়ালের উপকণ্ঠে। শামশাদ ফিকে চায়ের ধুমায়িত কাপ ঠোঁটের কাছে ধরেছিল । দারুণ আওয়াজে চমকে উঠতেই ছল্‌কে পড়ল গরম চা। মিল্ক হোয়াইট পুলোভারের আস্তিনে দাগ পড়ল চায়ের । এই শীতের মধ্যেও ওর চামড়ার ওপর আঁচ লাগল গরম কাপড় ভেদ করে। তাকাল সে চোখগুলি বড় বড় করে। গুল মোহাম্মদ খানও উৎকর্ণ হলেন। আলতোভাবে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, এ

www.pathagar.com

অঞ্চলেও এবার বোমাবাজি শুরু করল ব্যাটারা।

বেগম খানই সবচেয়ে বেশী ভীত হয়ে পড়লেন। তারও চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। আর্তস্বরে বললেন, হ্যাঁ গো, এখন তাহলে কি হবে?

—তুমি কিচ্ছু ভেব না বেগম, চোরের মতন ঢুকেছে ওরা আফগান মুল্লুকে, ইনশাআল্লাহ্ ঈমানদার আফগানদের হাতে ওদের নিস্তনাবুদ হতেই হবে।

—এখানে থাকাটা কি সঙ্গত হবে এখন?

গুল মোহাম্মদ খানের প্রশস্ত ললাটখানি কুঞ্চিত হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত কী একটা ভেবে নিলেন তিনি। তারপর বললেন, সেইটেই তো ভাবছি, বেগম! আমরা বুড়ো হয়েছি। আমাদের নিয়ে ভাবনা নেই। কিন্তু ...

বেগম খান বিহবল হয়ে বললেন, আমার শামশাদকে নিয়ে কী করব?

গুল মোহাম্মদ খান শুষ্ক হাসি ঠোঁটে রেখে বললেন, এখানে- এই দেহাত অঞ্চলে আমার শামশাদই কি একমাত্র মেয়ে, বেগম? আরো তো অনেকে আছে! ভাবতে হলে সবার কথাই তো ভাবতে হবে।

অস্থিরতার মধ্যে বেগম খান উঠে গেলেন। যাবার সময় 'আল্লাহ্' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর কণ্ঠ থেকে।

প্রচন্ড আওয়াজের ঘোর কাটলে গুল মোহাম্মদ খানের কথায় মনোযোগ দিল শামশাদ। সে সটান দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বসতে বসতে আত্মগত ভাবে বলল, রুশ-বাহিনী বাধ্য হয়ে বোমা ফেলছে। নইলে ওরা তো আমাদের বন্ধু। আমাদের গোটা অর্থ-সামর্থের শতকরা চল্লিশ ভাগই ওদের দান। ওদের এ বদান্যতা তো আমরা তুচ্ছ ভাবতে পারি না।

শামশাদের কথা প্রথমে যেন বুঝতেই পারছিলেন না গুল মোহাম্মদ খান। কিন্তু এক মুহূর্তে জিনিসটা তাঁর কাছে পরিস্কার হয়ে গেল। বিরক্তির চোখে তিনি তাকালেন মেয়ের দিকে। তাঁর মুখের কাঁচা-পাকা কদমফুলি গোঁফ জোড়া তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। বললেন, ভার্সিটির হালচালে দেমাগটা বিলকুল নষ্ট করে ফেলেছিস, বেটি। ওদের চল্লিশ শতাংশ সাহায্যের কথা স্বীকার করি বটে। কিন্তু রুশ টেক্‌নিশিয়ানরা, তার চেয়ে ধুয়ে-মুছে নেয় যে বেশি, সেটার কি খোঁজ রাখিস কিছু? ওটাই তো রাশান ট্রিক্‌স। ওরা ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। গত ডিসেম্বরে দশ ডিভিশন ফৌজ নামিয়ে যে হামলাটা চালাল, সেটা মানবেতিহাসের কলঙ্ক। এখন আবার বন্ধুত্বের খোলশ পরে সারা দেশটাকে ক্ষত-বিক্ষত করছে, দেখছিস না?

শামশাদ বানু বাদামী চোখের তারায় দ্বন্দ্ব উঁচিয়ে তাকাল বাপের মুখের দিকে। অবসরপ্রাপ্ত রাজকীয়-সরকারী কর্মকর্তাটির মনোভাব নয়া জামানার সঙ্গে কিছুতেই

www.pathagar.com

সংগতি ব্যঞ্জক নয়, সেটা সে উপলব্ধি করে অস্বস্তি বোধ করল।

ভার্সিটিতে পড়ার সময় শামশাদ বানু আজিজ ইকরামের সান্নিধ্যে আসে। আজিজ রূশ অর্থনীতিবিদ ভেরেনিওভের ছাত্র। আজিজ ইকরামের কাছেই সে সময় শামশাদ সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণের পাঠ গ্রহণ করে। তারপর থেকেই সে ধীরে ধীরে একজন কড়া রূশ সমর্থকে পরিণত হয়। দৃষ্টিভঙ্গীর একাত্মতা এবং একসাথে কাজ করার ফলে, দুজনের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্কও গড়ে উঠে।

সাতাশ বছরের যুবক আজিজ ইকরাম। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। ক্লীন শেভ্ড মুখাবয়ব। ছিপছিপে উজ্জ্বল ছয় ফুট উঁচু শরীর। চোখ দুটো হাল্কা সবুজাভ কাঁচের মত স্বচ্ছ। আজিজ ইকরামের হাতে ভার্সিটির দু'দুটো ডিগ্রী। একটা জার্নালিজমে অন্যটা ইকোনোমিক্স-এ। ভার্সিটির তুখোড় ছাত্রনেতা আজিজ সুবক্তা ও সংগঠক। তার বক্তৃতা শুনেই শামশাদ প্রথমে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আর সেই সূত্রেই ওর রূশ-প্রীতি শুরু হয়।

বাপের কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলি পাঠ করে ওর মনটা সহসা চুপ্‌সে যায়। সে মৃদু হেসে বলে, তোমার ধারণার সাথে একমত হওয়া যায় না, আব্বু। টেক্‌নিক্যাল যন্ত্রপাতির প্রয়োজনেই তো টেকনিশিয়ানরা আসে। ওটার পেছনে অযথাই তুমি বাজে মোটিভ তালাশ করছ, আব্বু!

মেয়ের কথা খানের কাছে বিস্ময়কর ঠেকল। আবার একটা বিরক্তির আভা জাগল তাঁর চোখে-মুখে। বিরক্তি ভরা দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। মেয়ের প্রতিবাদটা এবার বাস্তবিকই শক্ত শেলের মত লাগল তাঁর দিলে। এমনটি তিনি কল্পনাও করেননি কোনদিন। তেতো গলায় প্রশ্ন করলেন, এসব কি তোর ঐ ভার্সিটির শিক্ষা রে?

ফ্যাকাসে মুখে বিবর্ণ হাসি হাসল শামশাদ। মুখে ওর কথা নেই। আনত দৃষ্টি।

গুল মোহাম্মদ খান বলতে লাগলেন, সর্দার দাউদের স্বাধীনতা স্পৃহা, তাঁর জোট-নিরপেক্ষনীতি, রূশদের প্রতি সমতার দাবি কি অযৌক্তিক বলতে চাস্, বেটি?

আলোচনাটি তিক্ততর হচ্ছে দেখে ঘাবড়ে গেল শামশাদ। উত্তাপটা কমানোর জন্যে ফিকে হাসি ঠোঁটে এনে বলল, ব্যাপারটা খামাকা কমপ্লেক্স হচ্ছে, আব্বু! আমি একটা ধারণা ব্যক্ত করেছি মাত্র, এটা ভুলও তো হতে পারে!

—ভুল। একেবারেই ভুল। আই টেল ইউ ক্যাটেগোরিক্যালি, ইট্‌স অ্যাবসোলিউটলি রং। তোমাদের আইডিয়ার পেছনে প্ররোচনা আছে, লজিক নেই। বালখিল্যতা আছে, গভীরতা নেই। এর ভুলটি একদিন ধরা পড়বেই, বলে দিলাম।

www.pathagar.com

আর বাদ-প্রতিবাদে যাওয়া বিড়ম্বনা ভেবে শামশাদ দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। বলল, যাক্‌গে ওসব কথা। পাঞ্জশির কলেজে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি। ওখানে জয়েন করব ভাবছি। তুমি কী বল, আব্বু?

এই প্রসঙ্গে ফিরতে গুল মোহাম্মদ খানের বেশ দু'মুহূর্ত বিলম্ব হ'ল। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, দেশের এই অরাজক সময়ে আমি তোকে বাইরে পাঠাতে চাই না। তাছাড়া তোর ভাইদেরও খোঁজ পাচ্ছি না। ইমতিয়াজের খেয়ালটা ঠিক তোর উল্টো। বেটা যা আমার তেজিয়ান, দেখ্ না আবার সে জিহাদেই চলে গেল কি না!

জিহাদ কথাটি বলতে গিয়ে বেশ গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন গুল মোহাম্মদ খান। শামশাদও তার বাপের সাথে দারুণ অন্তর্বিরোধটা এবার পুরোপুরি অনুভব করতে পারল। সে নেহাৎ ছেলেমানুষের মত হালকা সুরে বলল, ওসব তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না, আব্বু! ভাইয়াদের তো বাইরে যাওয়ার কথা। এমনও তো হ'তে পারে গন্ডগোলের জন্যেই আমরা চিঠিপত্র পাচ্ছি না।

গুল মোহাম্মদ খান এবার আত্মগত স্বরে বললেন, না রে বেটি, আমাদের পূর্বপুরুষ গাজী রহিম ইয়ার খান কাফেরদের বিরুদ্ধে পানিপথের যুদ্ধে শাহ আবদালী হুজুরের দেহ-রক্ষী ছিলেন। আমার ছেলেরা আধুনিক শিক্ষিত হলেও, অন্তরে ওরা গভীর মুসলমান। তুই-ই কেবল আমাকে বিস্মিত করলি, শামশাদ!

এবার একটু থামলেন গুল মোহাম্মদ খান। থেমে বললেন, পাঞ্জশিরে তো রুশদের বড় ধরনের ঘাঁটি। সেটা জানিস তো?

শামশাদ তার অনুভূতি চেপে রেখে বলল, ফৌজরা থাকবে ঘাঁটিতে, আর আমরা থাকব কলেজে, ভয় কিসের, আব্বু? তাছাড়া আমি গিয়েই তো ভাইয়াদের একটা খোঁজ-খবর নিতে পারব। আমাকে এজাযৎ দাও, আব্বু!

মনের কথা মনের মধ্যেই চেপে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন গুল মোহাম্মদ খান'। ফিকে চা টী-পটেই ঠান্ডা হ'য়ে গেল।

শামশাদের চাকুরীর পেছনে আজিজ ইকরামের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। নিজে ত সে ঐ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। কলেজের বিভিন্ন বিভাগে আগে থেকেই জন পাঁচেক মহিলা কাজ করছেন। তাঁদের জন্যে একটি বাড়ি বরাদ্দ রয়েছে। বাঁড়ির সামনে মাঝারি একটা লন। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তারের জোড়ে জোড়ে চুমকির মতন নতুন নতুন গিঁটগুলি চকচক করছে। লনের ঘাসের ডগায় তুষারের হাজারো রকমারি ফুল ফুটে আছে। শামশাদ সে বাড়িতেই এসে উঠল।

সকালের দিকেই দেখা হয়ে গেল আজিজের সাথে। সদরের গেট খুলে কেয়ারি করা

www.pathagar.com

বাগানের মাঝ বরাবর রাস্তা ধরে আজিজ সোজা চলে এলো শামশাদের কামরায়। সারারাত বরফ ঝরেছে। টেম্পারেচার একেবারে শূন্য সেলসিয়াসে নেমে গিয়েছিল। হীটার জ্বেলে ঘরটা গরম করছিল শামশাদ। আজিজ ইকরামকে দেখে উপচে পড়া আনন্দে ডগমগ করে উঠল ওর মুখ-চোখ। আনন্দে সে চীৎকার করে উঠল। আজিজ কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বলল, রাতের খবর সকাল আটটা অব্দি না পাওয়াটা কি সুলক্ষণ? বলেই একটা বেতের চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিল সে।

তড়বড় করে উঠল শামমাদ বানু। বিশ্বাস করো, রাতে নেমেই একবার চেষ্টা করেছি। তোমার পিওনটা বলেনি তোমাকে? সে বলল, তুমি নাকি কোন্ মেজরের সাথে দেখা করতে গেছ। তখন আমার আর কী করার ছিল, তুমিই বল?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে যেতে হয়েছিল আমার বন্ধু মেজর নিকোভিচের কাছে। ভ্লাদিমির নিকোভিচ, একটা চমৎকার মানুষ। আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। তুমি দেখলে বুঝবে আমার কথাটা সত্যি কি-না! আর হ্যাঁ, ওর সাথে আগামীকালই বিকেলে একটা জায়গায় যাওয়ার প্রোগ্রাম। তুমি যাবে সাথে? গেলে ভারি চমৎকার হবে কিন্তু।

শামশাদ ভাবল এক মুহূর্ত। রুশ মেজরের সাথে প্লেজার ট্রিপে যাওয়াটা খুব স্বস্তিব্যঞ্জক মনে হ'ল না ওর। তবু হাসিমুখে প্রশ্ন করল, যাত্রাটা কি খুব দূরের? প্রশ্নের জবাব পাওয়ার আগেই সে বলল, যাক গে, এখন তো নরকে নিলেও যেতে হবে। বলে শামশাদ একটু জোরেই হেসে উঠল।

আজিজ ইকরামও সে হাসিতে যোগ দিল।

হাসি থামিয়ে আজিজ বলল, তোমার তো গত পরশু দিন আসার কথা ছিল?

—বললেই তো আর আসা যায় না, সায়েব! অবলা সরলা নারী, আমি কী করিতে পারি! আব্বু তো আসতেই দেবে না। প্রস্তাব শুনেই একেবারে বেঁকে বসল। তার গোবেচারা কন্যারত্ন কোথায় পা হড়কে সব্বোনাশ ঘটায়। আর নইলে কোন্ চিলে তাকে ছোঁ মেরে নেয়, সেই চিন্তায় অস্থির। অনেক কষ্টে ছাড়পত্রটা যোগাড় করেছি। এবার কণ্ঠস্বরটা একটু নামাল শামশাদ। বলল, জানো আজিজ, আব্বু কিন্তু রুশদের প্রতি হাড়ে হাড়ে চটা। মোটেও দেখতে পারে না।

—তাই নাকি? সত্যি বলছ তুমি?

—আরে বাবা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারে নির্জলা সত্যি। ভাবসাব দেখে আমার তো অবস্থা কাহিল। সেই চেহারা তুমি দেখলে নিশ্চয়ই ভড়কে যেতে।

—কেন রাগলেন?

—আমার একটা কথায় সামান্য রুশ-প্রীতি ছিল কিনা!

www.pathagar.com

—তাই?

—হ্যাঁ। ঘাড় নেড়ে সায় দিল শামশাদ বানু।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আজিজ ইকরাম কি যেন পড়ে নিল। তারপর দু' মুহূর্ত ভেবেচিন্তে বলল, শেষমেশ দেখছি তোমার নিজের ঘরেই জব্বর বাধা। যাকে বলে কোঁচের সাপ। এখন তো ঘরেই তোমাকে কাজ শুরু করতে হবে। আচ্ছা, তোমার ভাইদের খবর কি?

ভাইদের প্রসঙ্গ উঠলে শামশাদ একটু চমকাল যেন। এ মুহূর্তে ভাইদের ব্যাপারে ওর আব্বার কথাটা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, এখন তোমাকে কী দিয়ে আপ্যায়ন করি বলত? একেবারে নতুন জায়গা। তবে শুধু চায়ের ব্যবস্থা করার মত সংগতি আমার হবে। ভাল চা আর চিনি সাথে আছে। মিনিট তিনেকের ব্যাপার।

—আরে চা-ফা এখন কিচ্ছু লাগবে না। চা খেয়ে অসময়ে মৌতাতটা মাটি করব নাকি?

—মৌতাত মানে? অবাক চোখে তাকাল শামশাদ বানু।

—মানে ভোর বেলাতে বোতলখানেক ভদকা সেবন হয়েছে। আই ডোন্ট লাইক টী জাষ্ট আফটার ড্রিংক।

ভেতরে কোথায় যেন ঘা খেয়ে চমকে উঠল শামশাদ। বলল, তুমি মদ খাও, আজিজ?

—আশ্চর্য হচ্ছ খুব? ওটা খেলে কি মানুষ পচে যায় নাকি?

শামশাদ বানু শিথিল হয়ে পড়ল। কয়েক সেকেন্ড সে আজিজ ইকরামের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর ম্লান কণ্ঠে বলল, আমি খুবই দুঃখিত আজিজ! আমি কিন্তু ... শামশাদের মুখের কথা থেমে গেল।

আজিজ ইকরামও মৃদু হেসে বলল, এটা খুবই স্বাভাবিক। তোমার পরিবারটা তো মধ্যযুগীয়। ইট্স সো ডিপ রুটেড দ্যাট ইট্স ভেরী হার্ড টু গেট ইট রিমুভড ওভারনাইট।

শামশাদ বানুর চঞ্চলতা যেন স্তিমিত হয়ে গেল। কোন কথা না বলে সে বুক শেলফে বই সাজাতে লাগল।

এই ব্যাপারটা আজিজ ইকরামের দৃষ্টি এড়াল না। সে-ও চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, তোমার যখন আপত্তি তখন আজ থেকেই ইতি টানলাম। হেয়ার ইজ দ্যা এন্ড অব দ্যা

www.pathagar.com

চ্যাপটার। আই ওন্ট্ টাচ ইট এগেন। ঠিক আছে? আমার বজম ফ্রেন্ড ভাদিমির নিকোভিচ্ এ জিনিসটিতে অভ্যস্ত। আমাকে সেই শিখিয়েছে। তবে বাস্তবিক সে চমৎকার মানুষ। এ কম্প্লিট্লি ডেডিকেটেড সোল ফর আফগানিস্তান। এবার কণ্ঠস্বরটি আরও একটু নরম করল আজিজ ইকরাম। অনুনয়ের সুরে বলল, যাবে তো কাল ওখানে?

বই সাজাতে সাজাতে নির্লিপ্তভাবে শামশাদ বলল, তুমি যখন বলছ, যাব।

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আজিজ ইকরামের মুখমন্ডল। বলতে লাগল, শেরপোতে সো-কল্ড মুজাহিদ বাহিনী ঘাঁটি গেড়েছে। আজ রাতে মেজর নিকোভিচ্ অপারেশানে যাবে। ওটা আজ শেষ হয়ে যাক্। আমরা কাল বিকেলের দিকে যাব।

একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে শামশাদ ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

—তুমি আজ থেকেই জয়েন করছ নাকি? ক্লাস টাস তো আর হয় না এ-অবস্থায়।

শামশাদ উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, তোমার কী মত?

—আমার তো মনে হয়, ইউ শুড স্টার্ট ফোরথউইথ্। অখন্ড অবসর, বেতন নাও আর হাজিরা দাও।

—ঠিক আছে।

আজিজ ইকরাম এবার হাসিমুখে বলল, প্রতিক্রিয়াশীলরা যতদিন সারেন্ডার না করছে, ততদিন এভাবেই চলবে। যাক বিকেলে আবার দেখা হচ্ছে। এখন চলি, কেমন?

পরদিন ওরা দু'জন যখন মেজর ভ্লাদিমির নিকোভিচের ডেরায় পৌঁছুল তখন বেলা অপরাহ্ন। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা অনেকখানি হেলে পড়েছে। বাতাসের সাথে শীতটা ক্রমেই ভারি হয়ে উঠছে। তুলোর প্যাড দেয়া জ্যাকেট পরে, মাথায় টুপীর সাথে মস্ত বড় গালপাট্টার মতন কান-ঢাকা বেঁধে, একটা ফোর হুইল্ড জীপ গাড়ির বনেট উঁচু করে কী সব পরীক্ষা করছে নিকোভিচ্। ওদের আসতে দেখে একগাল হাসির সাথে অভ্যর্থনা জানাল সে। শামশাদ মৃদু হেসে বিনয়ের সাথে অভ্যর্থনার জবাব দিল। সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর ঢক্ করে বনেটটা নামিয়ে মেজর নিকোভিচ্ বলল, যেতে হ'লে আর দেরী করে লাভ নেই। ঝটপট গাড়িতে উঠে পড়ুন। আমরা শেরপোর ব্রীজ ডিঙোনোর আগেই চা খেয়ে নেব। তারপর ডাইরেক্ট রুটে চলে যাব।

—সেখানকার খবর কি? আজিজ ইকরাম জিজ্ঞেস করল।

মেজর নিকোভিচ্ জবাব দিল, সেখানে আজ পাখিও ডাকে না।

www.pathagar.com

দুজনেই খুশীর চোটে হেসে উঠল।

শামশাদ অবাক চোখে ওদের দিকে চাইল একবার। তারপরেই অকস্মাৎ দৃষ্টিটা নামিয়ে নিল।

মেজর ভ্লাদিমির নিকোভিচ্ স্টীয়ারিং হুইলে হাত রাখল। তার বাঁম পাশে আজিজ ইকরাম আর আজিজের বামে শামশাদ বানু উঠে বসল। তারপর হু হু করে ছুটে চলল গাড়ি। শেরপোতে পৌঁছুতে তাদের ঘন্টাখানেকের মত লেগে গেল। এক সময় একটা নালার ওপর ঝুলন্ত কাঠের ব্রীজের কাছে থামল ওদের গাড়ি। তারপর গাড়ি থেকে নেমে পড়ল তিনজন।

মেজর নিকোভিচ্ শামশাদের কাছে এসে দাঁড়াল। একটা হাসির ঝলক নেচে গেল মেজরের ঠোঁটে। হেসে হেসে বলতে লাগল, মাদাম, আপনি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালুন। কমরেড আজিজ আর আমি প্লেটে কাবাবটা সাজিয়ে ফেলি। আপনার কষ্ট হবে না তো, মাদাম?

—ওহ্, নো নো, চা ঢালা কি মেয়েদের কাছে শক্ত কাজ? শামশাদের কণ্ঠে কথাটি যেন আপনিতে ঝরে পড়ল।

মেজর নিকোভিচ্ আজিজ ইকরামের দিকে তাকিয়ে বলল, হিউম্যান ফ্লেমের রোষ্ট দেখে দেখে, এখন মাটন রোস্টও ঘেন্না লাগে, কমরেড! বলব কি, একেবারে সিমিলার স্মেল!

—ওসব কথা এখন রাখো, দোস্ত! মাদাম ভারি সেন্সেটিভ। হুট্ করে বিগড়ে গেলে ... শামশাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, কি, ভুল বললাম নাকি?

শামশাদের মাথায় ভাল করে ঢুকল না এসব কিছুই। সে একটু বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল, আমার হেঁয়ালি ভাল্লাগে না।

মেজর নিকোভিচ্ আর আজিজ ইকরাম নানা প্রসঙ্গে যেভাবে কথা বলতে শুরু করল, তাতে মনে হল সময়টা যেন ইচ্ছে করেই পার করে দিচ্ছে ওরা। শামশাদ ভাবছে কখন ফিরবে ওরা। ভেতরে ভেতরে সে উসখুস করতে লাগল। সে যেন বারে বারে খেই হারিয়ে ফেলছে। ওর স্বদেশকে নিয়ে ঐ দুজন মানুষের সাঙ্কেতিক, আধা সাঙ্কেতিক কথায় সে কিছুতেই মনোসংযোগ করতে পারছে না। শামশাদ ভাবতে থাকে, সে আজিজের বিবাহিতা স্ত্রী নয়, সহকর্মী আর প্রেমিকা। এইভাবে এ ধরনের একটা কিম্ভূত পরিস্থিতিকে সামনে রেখে তার কি বেরিয়ে আসা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে? এই ভাবনায় শামশাদ এখন ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল।

ধীরে ধীরে সূর্যটাও ততক্ষণে কুয়াশা ঢাকা পশ্চিম আকাশে ডুব দিল। কিন্তু তার

www.pathagar.com

পেছনে পেছনেই মস্ত গোলগাল ভরাট চাঁদটি পূবের আকাশে মুখ তুলে চাইল। ঘন কুয়াশার দুর্ভেদ্য আবরণে অল্পক্ষণেই সে আলো অনেকখানি ম্রিয়মান হয়ে পড়ল। এই দুর্বোধ্য আলোতে সামনে নিথর জনপদটিকে এখন একটি প্রেতপুরীর মত মনে হচ্ছে।

শামশাদের মনের ভেতর কী একটা দুর্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠছে এখন। সে অস্বস্তিতে উসখুস করতে শুরু করল। এক সময় আজিজ ইকরামের দৃষ্টি-আকর্ষণ করে বলল, কি, তোমরা রাত করে ফেলবে নাকি?

আজিজ ইকরাম কোন জবাব দিল না। বরং কথাটা লুফে নিল ভ্লাদিমির নিকোভিচ্। বলল, ভয় কি মাদাম! এটা তো সেফ জোন- শত্রুমুক্ত এলাকা। আমরা না হয় টেন্টেই রাতটা কাটিয়ে দেব। আপনার মত অমন অপরূপ আফগান সুন্দরীর সাথে একটি রাত টেন্টে কাটানো ... কি বল কমরেড!

আজিজ বশংবদের মত হেসে মাথা নোয়াল।

'অপরূপ আফগান সুন্দরী' কথাটি শামশাদের কানে হুলের মত বিঁধল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আজিজ ইকরামের মুখের দিকে তাকাল। মেজর নিকোভিচ্ ভালভাবেই শামশাদ বানুর প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করল। তারপর টেনেটেনে হেসে হেসে বলতে লাগল, শুনেছি মাদাম নাকি ভদ্কার ঘোরতর শত্রু। অনুমতি হলে ওই বস্তুটির সেবায় আজ আপনারও দীক্ষা হতে পারে।

শামশাদ বানু উঠে দাঁড়াল। দারুণ ঘৃণায় ওর অন্তরাত্মা রি রি করে জ্বলতে লাগল। সে ঘৃণা জড়িত কণ্ঠে বলল, ধন্যবাদ, মেজর সাহেব! আর যাই-ই বলুন আপনার প্রস্তাবটি আমার মোটেই ভাল লাগেনি।

মেজর নিকোভিচ্ তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, ঠিক আছে, চলুন, চলুন। আমরা আগে জায়গাটি দেখে নিই।

সেফ জোনই বটে। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। নিস্তরঙ্গ প্রকৃতিতে দারুণ নীরবতা বিরাজমান। শংকাহীন মেজর ভ্লাদিমির নিকোভিচ্ ব্রীজের পাশেই গাড়ি রেখে বলল, এবার যাওয়া যাক।

আজিজ ইকরাম বলল, গাড়ির চাবিটা তো গাড়িতেই রয়ে গেল!

মেজর নিকোভিচ্ বলল, তাতে কি হয়েছে? গাড়িটা কাক-পক্ষীতেও ছোঁবে না। লেট আস প্রসিড।

খানেওয়াল থেকে সোজাসুজি প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার পূবে আলশিরের উপত্যকা। তারও চার কিলোমিটার উত্তরে এই শেরপো। খানেওয়াল থেকে দিনের বেলা শুভ্র-ধবল

www.pathagar.com

মেঘের মত দেখা যায় গোটা এলাকার ঢালু উপত্যকা। এলাকাটা মোটামুটি ঘন বসতিপূর্ণ বলে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ লেগেই আছে। হত্যা, অগ্নিসংযোগ আর বোমাবাজিতে ওরা বিধ্বস্ত। রুশ সৈন্যরা কনভয় যাতায়াতের সুবিধার জন্যে ব্রীজের অনতিদূরে ঘাঁটি গেড়েছে। মুজাহিদ বাহিনী ওদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে বিপাকে ফেলে। তাই গতকাল রাত্রে একটি গেরিলা বাহিনী প্রাণপণ যুদ্ধ করে ঘেরাও হয়ে পড়ে। তখন তাদের হত্যা করা হয়।' তারপর রুশ বাহিনী সম্মুখের বিস্তীর্ণ জনপদ পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। ওদিকেই তিনজন এখন অগ্রসরমান।

' খাঁ খাঁ করছে চারদিক। একদিন আগেও এখানে হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখ বিজড়িত এক চিল্‌তে মায়াময় জনপদ ছিল। আজ তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাতাসে একটা অদ্ভুত কটু গন্ধ ভেসে আসছে। পোড়া পোড়া গন্ধ। শামশাদের বমি আসছে ঐ গন্ধে। সে রুমালে নাক ঢাকল। জিজ্ঞেস করল, কিসের গন্ধ বাতাসে?

নিকোভিচের কানে গেল কথাটা। বলল, স্মেল অব রোস্টেট হিউম্যান ফ্লেশ, মাদাম! হো হো ক'রে হেসে বলল, আমরা ওদের ছাই করে দিয়েছি, -বার্নন্ট টু অ্যাশেস'। আর ঐ ছাই-এর ওপর এখন প্রগতির লাল সূর্যের উদয় হবে। প্রগতিশীল আফগানিস্তানের নতুন সূর্য।

শামশাদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মেজর ভ্লাদিমির নিকোভিচ্ আর আজিজ ইকরাম আগে আগে হাঁটছে। পেছনে পেছনে শামশাদ বানু। নিকোভিচের কোমরে প্রহিবিটেড বোরের রিভলবার। একটা ষ্টেনগান আজিজের কাঁধে ছিল, সে শামশাদের কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে হেসে বলল, ফাইন! চমৎকার মানিয়েছে এবার। লাইক এ টু হিরোইন!

গোলগাল চাঁদটা বেশখানি উঁচুতে উঠে গেছে। চাঁদের দ্বিধাজড়িত কুয়াশা ঘেরা আলোয় সমগ্র উপত্যকাটি প্রেতপুরীর মত লাগছে দেখতে। চারদিক নীরব-নিঝুম। কেবল ওদের জুতোর আওয়াজে কিছুটা স্পন্দমান হয়ে উঠছে এই উপত্যকা। অল্প দূর এগিয়ে স্তূপের মত কী একটা দেখতে পেয়ে শামশাদ জিজ্ঞেস করল, কী ওখানে?

মেজর নিকোভিচ্ জবাব দিল, লাশ।

সহসা চমকে উঠল শামশাদ। বিহ্বল কণ্ঠে বলল, এত লাশ! কাদের লাশ?

—প্রগতির শত্রুদের। নিকোভিচের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ল কথাটি। আফগানিস্তানের প্রগতির পথে ওরাই তো বাধা। আজ সকালেও একজনকে খতম করা হয়েছে। সেই ছিল এই গেরিলা বাহিনীর লীডার। মারের চোটে শরীরের গোস্ত খসে খসে পড়ে তবু দোষ স্বীকার করতে চায় না। কী শক্ত প্রাণ! লোকটার নাম ইমতিয়াজ খলিল। বলে কি, আমি মুসলমানের বাচ্চা, মুসলমান। শহীদী জিন্দেগী ছাড়া আমার আর কিছু কাম্য নয়। হাঃ

www.pathagar.com

হাঃ হাঃ। ওর কাম্য জিনিসই দিয়েছি, কমরেড!

—কী! ইমতিয়াজ খলিল! শামশাদ বানুর মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। অকস্মাৎ যেন দুনিয়াটা ওর সামনে আঁধার হয়ে উঠল। যেন ভূমিকম্পে তার পা দু'খানি টলতে লাগল। তার সহোদরের নাম, ইমতিয়াজ খলিল, তাঁর প্রিয়তম একটি নাম। তাহলে আব্বুর কথাই ঠিক সত্যি। সত্যিই সে জিহাদে শরীক হয়ে আজই শাহাদত বরণ করেছে!

মেজর নিকোভিচ্ শামশাদকে খুশী করবার জন্যে হেসে হেসে বলতে লাগল, তবে জেনে খুশী হবেন, মাদাম! ওরা আফগানিস্তানের শত্রু হলেও, ওদের লাশগুলো কিন্তু দেশের সম্পদ। বুলডোজার দিয়ে ঐ লাশগুলি মাটিতে মিশিয়ে দিলে ওদের হাড়-মাংস জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দেবে। সোনার ফসলে ভরে উঠবে আফগানিস্তান...এ প্রোগ্রেসিভ আফগা ...।

কথা শেষ হ'ল না নিকোভিচের। দুম দুম করে ষ্টেনগানের দুটো গুলী মুহূর্তে ভেদ করে গেল ওর বুক। একটা বিকট চীৎকার দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে মেজর ভ্লাদিমির নিকোভিচ্।

বিষয়টা হঠাৎ আন্দাজ করতে না পেরে দারুণ চীৎকার করে উঠল আজিজ ইকরাম। হায়, এ কী করলে শামশাদ! শামশাদ বানু! ষ্টেনগানটা দিলাম ... শামশাদ বানু জবাব দিল না। তার হাতে উদ্যত সেই ষ্টেনগান, মুখে মনোবিপ্লবের গভীর আকুতি। আজিজ উম্মাদের মত বলতে লাগল, আমার বন্ধুকে খুন করলি তুই? তবে রে প্রতিক্রিয়াশীল হারামী, তুই জানিস্ মহান কমরেডের মৃত্যুর বদলা কি? বলে খুব দ্রুত নিকোভিচের কোমর থেকে রিভলবারটা খুলতে গেল সে। কিন্তু তার আগেই আরো একটা গুলী এসে আজিজ ইকরামের মাথার খুলি ভেদ করে চলে গেল। দারুণ চীৎকার দিয়ে সেও নিকোভিচের বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। শামশাদ বানু চোখের ওপর ওদের ছটফট করে মরতে দেখে কয়েকটি মুহূর্ত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর উপত্যকার ঢালু বেয়ে এগিয়ে চলল উল্টো পথে। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রীজের কাছে ফিরে এলো সে। লাফিয়ে উঠে ষ্টার্ট দিল রুশ মেজরের জীপটা। সফেদ উপত্যকার পরিচিত পথ ধরে এবার গাড়িটি ছুটে চলল মুজাহিদ শিবিরের উদ্দেশ্যে। জীপের ভেতর অপারেশনের মানচিত্র। মুজাহিদদের জন্য মহার্ঘ উপহার। কী একটু ভেবে অন্ধকারেই সে হেসে উঠল নিজেরই অজ্ঞাতে।

www.pathagar.com

মর্ডানিজ্‌ম-এর প্রতি আমার বরাবরই প্রবল টান। আর আমার বন্ধু আমিন ঠিক তার উল্টো। আমি পাড়া গাঁ থেকে শহরে এসেছি আর ওতো শহরেরই ছেলে। শহরে জন্ম, শহরেই মানুষ। তাছাড়া তার পরিবারটিও বেশ শিক্ষিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ঐ রকম কেন যে পিছুটান, তা ভেবেই আমার অবাক লাগত। আধুনিকতার প্রতি আমিনের এই অভাবনীয় বিরাগ লক্ষ্য করে ওকে দু'-একদিন এর কারণটাও যে জিজ্ঞেস করিনি তা নয়। কিন্তু ও জবাব দিত না, মুখ টিপে হাসত, আর চুপ মেরে থাকত।

জানি না এই কাহিনীটিই তার জবাব ছিল কি না।

আমাদের অনার্স পরীক্ষা তখন শেষ। ব্যাটলিবয়ের অ্যাডভান্সড একাউনটিং-এর ঢাউস বোঝাটি তখন সবে নেমে গেছে মাথা থেকে। মাথাটি যাকে বলে একেবারে তুলোর মতন হাল্কা। বাড়ি যাবার জন্যে লটবহর গোছ-গাছ করছি, আমিন এসে বলল, কী করছিস্।

বললাম, বেডিং রোল করছি।

—কোথায় যাবি?

—কেন, বাড়ি?

আমিন বলল, বাড়ি যাওয়া স্টপ করে দে। তার চে' চল একবার বিদেশ ঘুরে আসা যাক।

আমি উৎসাহিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, বিদেশ মানে?

আমিন বলল, হ্যাঁ, মামার ওখানে। এই দ্যাখ মামী চিঠি দিয়েছেন। বলেই একখানি নীল রঙের খামের ভেতর থেকে একখন্ড সাদা কাগজ বার করে সে আমাকে দেখাল।

আমি বললাম, যেতে বলেছেন তোকে, আমি কেন যাব?

জবাবে আমিন বলল, অমন পুজোর টিপে আমি একলা গেলে আনন্দ পাব না। তুই ছাড়া তো জমবেই না রে। মামুন ছাড়া বিদেশ ভ্রমণ, বৃক্ষ ছাড়া অরণ্য যেমন।

আমিন চিরদিনই আমার প্রতি অনুরাগী। তার কথার ভেতর কৃত্রিমতার নাম-গন্ধও ছিল না। আমি রাজী হয়ে বললাম, ঠিক আছে, চল যাওয়া যাক।

আমিনের মামা ভারতের এক অঞ্চলের একটা বিশাল অরণ্যের ফরেস্ট অফিসার,

www.pathagar.com

সে কথা আমার জানা ছিল। অনেকদিন আগের থেকেই আমিন আমাকে সেই মামা বাড়ির খুব মুখরোচক আর মজাদার গল্প শোনাত। সে-সব গল্প-কাহিনী শুনে শুনে আমার একটা কল্পনা মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। সেই কল্পনার আরণ্যভূমিটি নিজের চোখেই একবার দেখতে পাব, ভাবতেই আমি খুব রোমাঞ্চ বোধ করলাম।

বহু দূরের পথ। রেল, বাস করতে করতে প্রায় চৌদ্দ পনের ঘন্টা আমাদের পথে কাটল। শেষ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে একখানি ছ্যাকড়া বাস যখন টিপারি ডিহরি পার হয়ে বারমুন্ডাতে এসে পৌছল, তখন সেই বিশাল অরণ্যানীর মাথায় মাথায় কে যেন একটা বিধূর লালিমা ছড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের বারমুন্ডার পথের ওপর নামিয়ে দিয়ে লক্কড় বাসটি উত্তরের দিকে চলে গেল।

লটবহর নিয়ে প্রথমে আমাদের একটি ছোট নালা পার হতে হলো। নালার পানিতে চোখ পড়তেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। কাক-চক্ষু পানি। পাহাড়ে ঢালুর নীচে গভীর খাদ। খাদের গায়ে এবং পানির নীচে নাম-না জানা অসংখ্য উদ্ভিদ আর তার গোড়ায়-গোড়ায় হরেক রকম রঙ-বেরঙের পাথরের নুড়ি। কাঁচের মতন স্বচ্ছ পানির তলে ঐসব জিনিস এমন ঝকমক করছে যে দেখতে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে যায়। নালাটি পার হতে আমার তাই দেরি হয়ে গেল।

আমিন আগেই ওপারে পৌছে গেছে। সে সেখান থেকেই চীৎকার করছে, এই মামুন, দ্যাখ্ দ্যাখ্।

আমি নালাটা পার হয়ে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। নালার পাশে মস্ত বড় কী একটা গাছের গুঁড়ি কাৎ হয়ে পড়ে আছে। বোধহয় কোন এক সময় ঝড়ের তোড়ে গাছটি টিকতে না পেরে ঐ রকম কাৎ হয়ে পড়েছে। গাছের মাথাটি এই শীতের শেষে কচি হাল্কা সবুজ পাতায় পাতায় ভরে গেছে। আর সেই পাতারই ভেতর চুপচাপ বসে আছে মস্ত বড় একটা মুখপোড়া হনুমান।

জন্তুটি দেখে আমি চমকে উঠলাম। ছোট বেলায় গ্রামের বাড়িতে একবার একটা বাঁদর দেখেছিলাম। দলছুট সেই বাঁদরটি কোথা থেকে এসে বেঘোরে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ভয়ে ভীত নির্জীব ক্লান্ত সেই একরত্তি প্রাণীটি তখন হাঁপাচ্ছে বেদম। আমারও ভয় লাগছিল ভীষণ। কিন্তু বসেছিলাম দাদীর কোলে, তাই ঘাবড়ানোটা টের পাইনি। এই মুহূর্তে ঐ বিকট কালি মুখো জন্তুটি দেখে আমার কেমন গা ছমছম করে উঠল।

আমিন বোধকরি আমার অবস্থাটি আন্দাজ করে ফেলেছে। বলল, কি রে, ঘাবড়ে গেলি নাকি?

আমি আড়ষ্ট গলায় জবাব দিলাম, নাহ্।

আমিন আশ্বাসের সুরে বলল, ঘাবড়াবার কিছু নেই। এখানে জন্তু জানোয়ার যা

www.pathagar.com

আছে, তাদের কেউ ত্যক্ত করতে পারে না। এই জঙ্গলটিকে বলে অভয়ারণ্য। তার মানে জন্তু-জানোয়ারের এখানে কোন ভয় নাই। ওরাও তাই মানুষ-টানুষ দেখলে বড় একটা পরোয়া করে না।

জন্তু জানোয়ার পরোয়া করুক আর নাই করুক, আমিনের আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও আমার বুকের ভেতরকার যন্ত্রটি নিয়মের চেয়ে একটু বেশি বেশি ধড়ফড় শুরু করে দিল।

অভয়ারণ্যের নির্ভীক হনুমানের দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ বন পথের একদিকে দূরাগত একটি ঘরঘর শব্দ শোনা গেল। আমি জিজ্ঞাসু মুখে আমিনের দিকে তাকাতেই ও বলল, ঐ যে গাড়ি আসছে!

এক মিনিটের মধ্যেই ছাই রঙের একটা চমৎকার পিক আপ ভ্যান আমাদের কাছ থেকে দশ গজ দূরে ঘচাং করে ব্রেক কষে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামলেন একজন প্রৌঢ় মানুষ। মুখের হোল্ডারে তার সাদা কাঠি। চোখ দু'টো চশমার কাঁচের ফাঁক দিয়ে চক চক করছে। টল, হ্যান্ডসাম, বনেদী চেহারা। সাথে তাঁর বছর আঠারো উনিশের একজন তন্বী তরুণী।

ভদ্রলোক হাসিমুখে সামনে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, লেট হল যে!

আমিন ঝটপট বলে যেতে লাগল, লেট হবে না মামা! রাস্তার যা করুন অবস্থা! সারাটা পথ ধূলোয় ধূলোয় একাকার। তার ওপর বাসগুলো সব লক্কড় গাড়ি। বেলাবেলি এসে গেলাম, তাই বড় ভাগ্যি। রাত হয়ে গেলে একটা মুসিবত যা হত না!

আমিনের মামা ওর কথার জবাব না দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। প্রশ্ন করলেন, ইনি?

আমিন ধড়ফড় করে বলে উঠল, ও আমার ক্লাশ ফ্রেন্ড, মামুন।

—তাই নাকি? ভেরি গুড্। তা এই বাঘ-ভালুকের জঙ্গলে তুমিও আমাদের দেখতে এলে বাপু! আমার সত্যি কীযে আনন্দ হচ্ছে!

আমিনের মামার এই সদালাপী ব্যবহারে প্রাণটা সত্যিই জুড়িয়ে গেল। কিন্তু সেই প্রাণটাই আবার বাঘ-ভালুকের নাম শুনেই আচকাচিয়ে উঠল। আমি কোন কথা না বলে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তরুণীটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি চোরা দৃষ্টিতে তার পলকহীন চাহনিটি লক্ষ্য করলাম। দেখতে সুন্দরী। মাথায় একরাশ শ্যাম্পু করা চুল। বুনো বাতাসে বেসামাল হয়ে উড়ছে। মুখে হাল্কা পাউডারের পোঁচ। পরণে ফিরোজা রঙের শাড়ী। গাঢ় সবুজ ব্লাউজ। বেশ বুদ্ধিমতী, রুচিমতী দেখতে।

www.pathagar.com

আমিনের মামার 'বাঘ-ভালুক' কথাটি উচ্চারণের সময় আমার মুখ-চোখের প্রতিক্রিয়াটাই সে দেখে ফেলেছে কিনা জানিনা। মেয়েটি এবার তড়বড়িয়ে উঠে বলতে লাগল, বাবার যত্তোসব কাণ্ডকারখানা। মানুষকে টেরিফাই করা তোমাদের নেচার। এই জঙ্গলে বাঘ-ভালুক কোথায় যে তার নাম করে ঐ রকম একজন আধমরা মানুষকে তুমি আরো ফ্রাইটেন্ড করে তুলছ? খামোখা মানুষকে ঘাবড়ে দেয়া।

আমিনের মামা তার মেয়ের কথায় কোন রকম বিরক্ত হলেন না। বরঞ্চ খানিকটা খুশীই হলেন মনে হয়। হাসিমুখে তিনি গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ওপাশ থেকে একটু উঁচু গলায় বললেন, বন-জঙ্গল মানেই তো শ্বাপদের আস্তানা। মেক হেস্ট, তোমরা চটপট গাড়িতে উঠে পড়।

নিজেকে আধ মরা ভাবতে আমার বড্ডো শরম করে। তার ওপর একজন সুন্দরী তরুণীর মুখের সেই বর্ণনা। ভয়-ভীতির জন্যে চেহারার যে পরিবর্তন হয়েছে, তার ওপর তো আমার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সুতরাং কী করব ঠিক করতেই আমি হিমশিম খেতে লাগলাম।

আমিন গাড়িতে উঠতে উঠতে তরুণীটিকে লক্ষ্য করে বলল, কেমন আছিস্ শিরী?

শিরী আমাদের সামনের গদিটায় গিয়ে বসল। তারপর বলল, ভাল নাই, আমিন ভাই।

—কেন, ভাল নাই কেন?

শিরী আমার মুখের ওপর চোখ রাখল। তারপর ছোট্ট একটা হাই তোলার মতন করে খুব নীচু গলায় আমিনকে উদ্দেশ্য করে বলল, সে কথা জেনে কী লাভ তোমার?

—সুতরাং "তুমি জানিতে চেয়ো না আমার মনেরো কথা," কেমন?

শিরীর মুখে কোন জবাব নাই। কেমন যেন নিরুৎসাহ ভাব।

আমার মনে হল শিরীর সাথে আমিনের বহুদিনের সম্পর্ক। আমার চোখের ওপরই এখন ওদের মান-অভিমানের পালা শুরু হয়েছে। এই রকম খোলামেলা প্রেম-প্রেম ভাব তো নাটকে-সিনেমায় দেখতে আমি সদাই অভ্যস্ত। কিন্তু চোখের ওপর এমন দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। সত্যি বলতে কি, আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। আবার বড় আশ্চর্য্যও লাগল! কারণ, নিঃসন্দেহে আমিন আমার ক্লোজ বোজম্ড ফ্রেন্ড। সব কথাই সে অকপটে আমাকে জানায়। শিরী নামের এই সুন্দরী মেয়েটির সাথে তার যে অমন ভালবাসা আছে, একদিনও সেটা কিন্তু আমাকে সে জানতে দেয়নি। যা হোক, অমন অপরূপ সুন্দরী আধুনিকার প্রেমিক হওয়ার সৌভাগ্য তো সবার হয় না। এই মুহূর্তে আমিনের প্রতিও আমার মনে খানিকটা ঈর্ষা দেখা দিল। আমি খুব সন্তর্পনে সেটা চেপে

www.pathagar.com

গেলাম। বার বার আমার মনে হতে লাগল, আধুনিকতার বিরোধী হিসেবে আমিন যতই লাফ-ঝাঁপ করুক, কার্যতঃ তার সবকিছুই মিথ্যা। অমন স্মার্ট একজন তরুণীর প্রেমিক হওয়া কোন আউট ডেটেড লোকের কম্ম নয়।

গাড়ি আমাদের নিয়ে ঘরঘর করে ছুটে চলল সামনে। জঙ্গলাকীর্ণ পথ। দু'ধারে নিবিড় অরণ্য। গাছগুলি চিনি না। চিনলেও হয়ত এই দ্রুতগামী গাড়িতে বসে সে সব ভালভাবে ঠাহর করে চিনে ওঠা সম্ভব ছিল না। ঐ একরত্তি মেয়ে, যে কিনা আমার চাইতে বয়সে কমপক্ষে চার-পাঁচ বছরের ছোট, তার কাছে আমি একেবারে নিস্তনাবুদ হয়ে যাচ্ছি। সেই দুঃখটাও আমার বুকে আগুনের হল্কার মতন বারবার জ্বলে জ্বলে উঠছিল। সুতরাং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমার মুগ্ধ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

শিরীই প্রথম কথা বলল। কথা বলার আগে চুলগুলি ডান হাতের আঙুলে পরিপাটিভাবে সাজিয়ে মিষ্টি করে হাসল। তারপর বলল, তুমিও ঐ কাজটা করে গেলে?

—কোন্‌টা? আমিন অবাক চোখে তাকিয়ে জানতে চাইল।

—বাবা যে বাঘ-ভালুকের ভয় দেখাল ভদ্রলোককে, তার তুমি প্রটেস্ট না করে চুপ করে রইলে?

আমিন হেসে উঠল। ওরে বাপ্‌রে ভদ্রলোকের দুঃখে তোর করুণা-সিন্ধু উথলে উঠেছে দেখছি! কী রে, লাভ অ্যাট দ্যা ফাস্ট সাইট্ যাকে বলে তাই হল নাকি?

আমার সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। অনর্থক বলে উঠলাম, আহ্, আমিন!

ভেবেছিলাম শিরী আমিনের এই মাত্রাজ্ঞানহীন মন্তব্যে লজ্জারাঙা হয়ে উঠবে। কিন্তু ওর মুখ-চোখে কোনই পরিবর্তন দেখা গেল না। আমি আরো বেশি অবাক হয়ে গেলাম। বনপথের এই অংশটা বেশ খানিক এবড়ো-থেবড়ো, অসমতল। গাড়ি চলতে গিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। ঝাঁকুনিতে শিরীর নরম শরীরটি দুলে দুলে উঠতে লাগল।

শিরী বলল, তুমি যাই বল, আমিন ভাই, তোমার প্রটেস্ট করা উচিৎ ছিল।

আমিন এবার একটু যেন সিরিয়াস হয়ে উঠল। বলল, বাঘ-ভালুক যে এ জঙ্গলে নাই, সে তো সবাই জানে। তার আবার প্রটেস্ট করব কি? তুই প্রটেস্ট করতে যে কেন বলছিস, সেটা আমি জানি না মনে করিস? মামার সাথে আমার টাস্‌ল হোক, তুই তাই চাস্।

আমিনের কথায় শিরী আরো রেগে উঠবে কি, অবাক হয়ে দেখলাম, উতলানো দুধে ঠান্ডা পানি পড়লে যেমন দুধটা হাঁড়ির তলায় বসে যায়, মেয়েটি তেমনি করে চুপসে গেল।

www.pathagar.com

ওদের এই রহস্যময় আচরণ আমাকে আরো অবাক করে দিল। আমি তবু চুপ করেই রইলাম।

শিরী এবার ধীরে ধীরে বলল, ও, বাঘের ভয় তাহলে তোমারও আছে দেখছি!

—বাঘ না হোক, বাঘিনীর ভয়ে তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া, জানিস না তা?

শিরী চোখের কোণায় বিজলী জ্বেলে বলল, বটে!

—নয়? কিন্তু অত ভয়-ডর আমরা করি না। আমাদের সাথে পাক্কা শিকারী রয়েছে। বলেই আমিন আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি তার ভাব-সাব দেখে লজ্জায় ঘেমে উঠলাম।

শিরী কেমন ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, ওরে আমার শিকারী রে! যাকে শিকারী বেড়াল বলে, তার গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।

লজ্জায় আমি একেবারে কাহিল হয়ে উঠছি। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ। আমাকে নিয়ে এই যে নৃশংস রসিকতা শুরু হল, তাকে রোধ করবার জন্য একবার মরিয়া হয়ে উঠতে চাইলাম। কিন্তু মরিয়া হতে যা মনোবল লাগে, আমার তা সংগ্রহ করার মতন হিম্মত ছিল না।

আমিন বলল, আরে গোঁফ দেখে তুই চিনবি কি? গোঁফটা তো ও রেখে এসেছে সেই কলেজ হোস্টেলে। একটু সময় দে গজাতে। তখন দেখিস কি ভয়ানক শিকারী বেড়াল ওটা।

শিরী আমাকে বোবা থাকতে দেখে একেবারে ঝলমলিয়ে উঠল। বলল, রেখে আসা হয়েছে? কারণ কি, কারণটা কি এই যে, চতুর শিকারী বেড়ালকে সবাই ভেজা বেড়ালটি মনে করুক। চমৎকার টেকনিক তো! কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো, আমিন ভাই? তোমার শিকারী বেড়ালের শিকার ধরা দিল্লী দূর অস্ত।

আলোচনাটি আমার জন্যে দারুণ জটিল হয়ে পড়ল। ভাবলাম তার রহস্যের গিঁট কেটে ব্যাপারটা সহজ করে ফেলব, কিন্তু সহজ করা তো দূরের কথা, আরো কঠিনই হয়ে গেল। আমি মুখ খোলারই চান্স পেলাম না।

আমিন হাসিমুখে বলল, টাইগ্রেস অব দ্যা জাংগল এবার বশীভূত হবার জন্যে নিশ্চয়ই প্রস্তুত?

—ওয়াক থু। বলে গাড়ির পেছন দিয়ে একদলা থুথু ফেলে কেমন অদ্ভুত গলায় শিরী বলে উঠল, দ্যা টাইগ্রেস ইজ সো ফেরোসাস দ্যাট ইউ কান্ট ইমাজিন, মাই বয়!

www.pathagar.com

আমি শিরীর অদ্ভুত মিষ্টি কথার ঢঙে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

শিরী আর আমিনের রসিকতা ভরা তর্কাতর্কির মধ্যে গাড়ি এসে মস্তবড় একটা বাংলোর সামনে থামল। বাড়ির সম্মুখভাগে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা প্রশস্ত একখানি লন। গ্রাস্ হপার দিয়ে সমান করে ছাঁটা দূর্বাঘাসের আচ্ছাদনটি দেখে মনে হচ্ছে সারাটি লন জুড়ে একখানি পুরু সবুজ গালিচা বিছানো রয়েছে। বাম-ডান দু'পাশেই দু'টি সিজন ফ্লাওয়ারের বাগান। বাগান দু'টি একেবারে একই রকম দেখতে। মাঝ বরাবর লাল সুড়কি ঢালা রাস্তা। দু'ধারের বাগানে হরেক রঙের ডালিয়া, ক্রিসানথেমাম আর কসমসের ছড়াছড়ি। রাস্তার শেষপ্রান্তে ঠিক বাংলোর ফটক জুড়ে চমৎকার একটি বোগানভেলিয়ার গাছ। ক্রিমসন-রেড ফুলে বাড়িটি ঝলমল করছে। আমরা সবাই সেই লনের মধ্যে নেমে পড়লাম। নিঝুম এই আরণ্যভূমিতে এমন সুন্দর একটি বাংলো দেখে মনে হল, এখানে বুঝি কোনদিনই কোন দুঃখ-বেদনার প্রবেশাধিকার নাই।

আমিনের মামার কোথায় জরুরী কাজ ছিল। আমাদের তিনজনকে নামিয়ে দিয়ে তিনি সাত-তাড়াতাড়ি সেই গাড়িতেই আবার উল্টোপথে রওনা দিলেন।

খুব ভাল লাগল আমিনের মামীকে। মানুষটির বয়স মন্দ হয়নি, কিন্তু সে বয়সটাকে তিনি আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে শাড়ি-সেমিজ-ব্লাউজ আর একরাশ প্রসাধনীর অন্তরালে লুকিয়ে ফেলেছেন। আমাদের দেখে তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। আমিন এবং আমার প্রতি তাঁর সীমাহীন আদর যত্ন দেখে মামী-ভাগিনার তিক্ত সম্পর্কের সেই চিরকেলে মন্দ ধারনাটিও আমার একেবারে পাল্টে গেল। এই স্নিগ্ধ বনানীর আকর্ষণ তার উপর ভদ্র মহিলার অভাবিতপূর্ব আদর-আপ্যায়ন, বিশেষ করে আমার মনে এই ধারণা জন্মে দিল যে, যাই হোক, এই বাড়িটি ছেড়ে যাবার যখন সময় হবে, তখন প্রাণে বড়ই ব্যথা বাজবে। কী হারানোর বেদনায় আমার ঐ রকম কষ্ট হবে, তার তত্ত্ব-তালাশ করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে, শিরী নামের ঐ তন্বি তরুণীটি আমার হৃদয় ও মনের ওপর তার দখলদারীটা পুরোপুরি কায়েম করে নিয়েছে। প্রথম দিন শিরীকে আমিনের প্রেমিকা ধারণা করে মনের মধ্যে যত ব্যথা আমি পেয়েছিলাম, দু'দিন বাদে শিরী ও আমিনের আচরণে আমার ভুল ভাঙলে, আমি তার চেয়ে হাজার গুণ আনন্দ অনুভব করলাম। অন্যদিকে শিরীর ইঙ্গিতময় চলন-বলন, তার বাঁকা চোখের বিদ্যুৎ-প্রভা আমার মধ্যে প্রতিদিনই চঞ্চলতা সৃষ্টি করে চলেছিল।

এইভাবে সুন্দর থেকে সুন্দরতর, সুন্দরতর থেকে সুন্দরতম দিনের কল্পনায় বিভোর হয়ে আমার দিনগুলি যাচ্ছিল কেটে।

www.pathagar.com

আমিনের পাখি শিকারের ভারি ঝোঁক। প্রতিদিন সকাল বেলা নাশতা সেরে সে বেরিয়ে পড়ে শিকারে। আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়। বন্দুক, টু-টু বোর রাইফেল, এয়ারগান সবই আছে আমিনের মামার। রাইফেল আর বন্দুক থাকে লুকানো। আমিন জানে রাইফেল-বন্দুকের ব্যবহার এই ফরেস্ট এরিয়ায় নিষিদ্ধ। তাই সে ও দু'টো জিনিস ধরে না। বিলিতি এয়ারগানটা নিয়েই পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়ে। ঘুঘু হরিয়াল মারা যাবে কিন্তু সমস্ত বনভূমি বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠবে না, এটা মস্ত সুবিধা।

সেদিন বনময় পই পই করে ঘুরে একটিও শিকার না পেয়ে আমরা দু'জন খালি হাতে ফিরছি। পথের বাঁক ঘুরতেই হঠাৎ একজন যুবকের সাথে দেখা। পরনে তার নেভি ব্লু জিন্সের ট্রাউজার, গায়ে টুইলের হাওয়াই সার্ট, চোখে রোল্ড গোল্ডের সরু সানগ্লাস, মাথার চুলগুলি ব্যাকব্রাশ করা। ছেলেটি একটা ব্রান্ড নিউ বাইসাইকেলে করে বনের পথ ধরে কোথায় যেন যাচ্ছিল। আমাদের দেখে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল। আমাদের হাসি মুখে তার পরিচয় দিয়ে বলল, মেরা নাম সাজ্জাদ।

নাম বললেই তো আর মানুষকে চেনা যায় না। গায়ে পড়ে সে যখন পরিচয় দিল, তখন সৌজন্যের খাতিরেই আমিন বলল, আমার নাম আমিন।

আমি বললাম, আমার নাম মামুন।

সাজ্জাদ হাসিমুখে বলল, মুঝকো মালুম হ্যায়।

আমাদের ভারি আশ্চর্য লাগল। আমিন তো জিজ্ঞেস করেই বসল, হাউ?

সাজ্জাদ বলল, আপ আজিজ সাবকা ভাগিনা হ্যায় না?

—ইয়েস, ইয়েস। আমিন জবাব দিল।

—ম্যায় বিলকুল জানতে হুঁ। ক্যায়া বাত, আপকা গেম্‌স্ কঁহা? বলেই সে আমাদের আপাদমস্তক ঢুঁড়তে লাগল।

—নট এ সিংগল শট ডাউন। আমিন হাত উল্টে বলল।

—নট এ সিংগল? গোলি নেহি কিয়া?

—আরে ব্রাদার গুলি করেনি মানে? এক বাক্সো গুলি তো বিলকুল খতম হওয়ার পথে! আমি জবাব দিলাম।

সাজ্জাদ হেসে উঠে বলল, তবে তো বড়া শিকারী! আভি খালি হাত মেঁ ওয়াপস যানে বালা। ইয়ে তো বহোত শরম কী বাত।

ছেলেটির মিশুক স্বভাব দেখে আমারও খুব ভাল লাগল। চেহারায় অনেকটা

www.pathagar.com

বাঙ্গালী-বাঙ্গালী ভাব থাকলেও সে-যে অবাঙ্গালী সেটা তো স্পষ্ট। বুঝতে পারলাম বাংলাও সে মন্দ বোঝে না। বললাম, শরম কী বাত হলেই আর কি। হাতের নিশানা ঠিক না থাকলে কি আর পাখি বন্দুকের নল দেখে পড়বে?

আমার রসিকতায় সাজ্জাদও হাসল। তারপর সাইকেলটি মাটিতে শুইয়ে রেখে বলল, আইয়ে মেরে সাথ।

সাইকেলটি সেখানেই পথের ওপর পড়ে রইল। আমরা সাজ্জাদের সাথে সাথে চললাম সামনের দিকে এগিয়ে। পায়ে হাঁটার জংলি পথ। সামনে দেখি প্রশস্ত একটি বিলের মতন জলাভূমি। ফরেস্টের এই দিকটা বেশ ফাঁকা। মখমলের মতন সকালের নরম রোদ উছলে পড়েছে ঝিলের পানিতে। শীত-সকালের মিষ্টি রোদের ছোপ-রাঙানো গাছ-গাছালিতে-জলা ভূমিটির চারদিক ছাওয়া। স্বচ্ছতোয়া সেই পানির ক্যানভাসে ফুটে আছে অজস্র শাপলা-শালুক। আর চারিদিক মুখরিত হয়ে আছে হরেক রকম পাখ-পাখালির কিচির মিচির কলরবে।

সাজ্জাদ একটি আমলকী গাছের দিকে চোখ পড়তে ইঙ্গিতে এয়ারগানটি চেয়ে নিল।

আমিন বন্দুকটি তার হাতে দিতে না দিতে এক মুহূর্তে সে গাছের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ল। আমাদের অবাক বিস্ফারিত চোখের সামনে গাছ থেকে ঝুপ করে একটি পাখি শুকনো পাতার মধ্যে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

সাজ্জাদই দৌড়ে কুড়িয়ে এনে আমিনের পেননাইফ দিয়ে জবাই করে দিয়ে বলল, দিস ইজ এ ভেরি ফাইন অরিওল।

হরিয়ালটা আমার হাতে ধরে দিয়েই সে ছুটল ঝিলের ধারে ঝুঁকে পড়া জংলি আম গাছের দিকে। গাছটির ন্যাড়া ডালে চমৎকার একটা কিং ফিশার উল্টোমুখে বসে বসে রোদ পোহাচ্ছে। সাজ্জাদ পা টিপে টিপে গাছের নীচে গিয়ে সেটাকেও ঠস্ করে ফেলে দিল। সাদা-কালোয় মেশানো ছোপ দেওয়া অদ্ভুত পাখিটি মাটিতে পড়ে একটুও নড়াচড়া করল না।

সাজ্জাদের এই অবাক-করা দক্ষতা দেখে আমার চমক লেগে গেল। এয়ারগানে পাখি মারা এমনিতেই চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তার ওপর অন্যজনের এয়ারগান দিয়ে হঠাৎ হাত-সই করে পাখি শিকার প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার। আমার বাস্তবিকই তাক লেগে গেল।

পাখিটি নিয়ে সাজ্জাদ জবাই করতে গেলে আমিন বলল, মাছরাঙা জবাই করে কী হবে? মাছরাঙা মানুষে খায় নাকি?

www.pathagar.com

সাজ্জাদ চোখ দু'টো বড় বড় করে অবাক হয়ে বলল, কেয়া? খায় নাই? ডোঙ্কু ইট্ কিং ফিসার? ইস্ সে বহোত আচ্ছা রোস্ট হোতা। শিরী হ্যায় না... বলেই সে থতমত করে হঠাৎ থেমে গেল। দেখলাম চোখ-মুখ তার কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। আমিন ওকে কথার মাঝখানে থামতে দেখে বলল, কেয়া হুয়া শিরী কা?

সাজ্জাদ এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল, তারপর বলল, শিরী কী মা হ্যায় না, মিসেস আজিজ? উনহুনে বহুৎ আচ্ছি রোস্ট বানানে সাক্‌তি।

আমিন জিজ্ঞেস করল, ওরা এইসব মাছ রাঙা-টাঙা খায় নাকি?

সাজ্জাদ চঞ্চল গলায় বলে উঠল, খায় নাই? বহোত খায়। সাজ্জাদের গলাটি খানিক সহজ হয়ে এলো। কিং ফিসার তো বিলকুল হালাল হ্যায়।

—তাই নাকি? নাক-মুখ কেমন বিকৃত করে প্রশ্ন করল আমিন। কথাটি শুনেই যেন তার গা ঘিন ঘিন শুরু হয়েছে।

পাখ-পাখালির হারাম-হালালের ব্যাপারে আমার কিছু জানা-শোনা ছিল। আমি বললাম, মাছ রাঙা মনে হয় হালাল রে, আমিন! যে পাখি পায়ে ধরে ঠোঁট দিয়ে খায় সেই পাখির গোশ্‌ত হারাম। মাছরাঙা তো পায়ে ধরে খায় না।

আমিন বলল, তবে নিয়ে নে রোস্ট করে তুই খাস।

সাজ্জাদ বলল, এই জঙ্গলে ঘুঘু-হরিয়াল পাওয়া যায়। ওগুলো মারাও খুব কঠিন নয়। তবে এখানে এই বিলে এক রকম মাঝারি ধরনের সাইবেরিয়ান ডাক পাওয়া যায়। শিকার করা খুব কঠিন। এয়ারগানের তো কমই নয়। ঠিক মাথায় যদি গুলি লাগানো যায়, তাহলে পড়তে পারে। কিন্তু সেটা প্রায় অসম্ভব। সাজ্জাদের জীবনে মাত্র দু'বার দু'টি সাইবেরিয়ান ডাক সে মেরেছে। আর তাও হাতের এই এয়ারগানটি দিয়েই।

সাজ্জাদের ঐ দক্ষতার রহস্যটা এবার আমার কাছে খোলাসা হয়ে গেল। ছেলেটি আমিনের মামার পরিবারে যে পরিচিত তা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম।

ফেরবার পথে সাজ্জাদের সাথে আমাদের আলাপ-সালাপ বেশ খানিকটা জমে উঠল। আমার জানতে ইচ্ছে হল, সে কী করে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী করেন?

প্রশ্ন শুনে সে একবার অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। তারপর বলল, নাথিং, ইউ ক্যান সে আভ্যাগাবন্ড।

—লেখাপড়া?

সাজ্জাদ হেসে বলল, ওহি চ্যাপ্টার ম্যায় খতম কর্ চুকা।

www.pathagar.com

হঠাৎ আমি একটি আপত্তিকর প্রশ্ন করে বসলাম। কতদূর লেখাপড়া করেছেন?

সাজ্জাদ খানিক চুপ করে রইল। ভয় হল, বেচারা মনে আঘাত পেল নাকি? দেখলাম না, সে রাগেনি। বরং হাসিমুখে জবাব দিল, লিখিপড়ি? নাথিং সিগনিফিক্যান্ট।

আমিন তাও জেরা করতে লাগল। ভাঙা ভাঙা উর্দু-বাংলা মেশানো সেই কথা শুনে আমারও হাসি চাপছিল খুব। কিন্তু আমিন বলেই চলল, আপ্ কেতনা দূর পড়া?

—থোড়া থোড়া।

আমিন ওর পিঠ চাপড়ে আবেগ ভরে বলে উঠল, আরে বাতাও না ইয়ার। শরম করতা কেয়া? "যব পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া" হিন্দী গানের কলিটি আমিনের জানা ছিল। সেই গানের ভাষাটিই সামান্য হেরফের করে আমিন কাজে লাগিয়ে দিল।

সাজ্জাদ এবার চমকে উঠল। বাধ্য হয়ে আমতা আমতা করে বলল, আই ওয়াজ স্টাডিয়িং কেমিষ্ট্রী ইন দ্যা স্টেট্স, বাট ব্রোক দ্যা জার্নি অন দ্যা ওয়ে।

আমিন আশ্বস্ত হয়ে ঘাড় দোলাল।

আমি প্রশ্ন করলাম, হুয়াটস দ্যা রিজন ফর ইয়োর ব্রেকিং স্টাডিজ?

সাজ্জাদ প্রশ্ন শুনে কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে গেল। তারপর তেমনি আমতা আমতা করে বলল, রিজন? দ্যার্স রিজন বাহাইন্ড। বাট নট ওয়র্থ সেইং।

কথা বলতে বলতে আমরা তিনজনে বাংলোর সদর রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে চলে এলাম।

আমিন ওকে বলল, আইয়ে মেরে সাঁত।

সাজ্জাদ হঠাৎ বেঁকে বসল। বলল, নেহি ব্রাদার। হম্ উঁহা নেহি যায়েঙ্গে। বলেই সে শাঁ করে বাইকে উঠে চোখের পলকে বনপথে উধাও হয়ে গেল।

আমি আমিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার?

আমিন বলল, ছাড় ব্যাটা ছাতু খোরের কথা।

—তুই কি আগেও ওকে চিনতিস নাকি?

—এই তো পরিচয় হল। আগে আর কখন দেখব? বলেই আমিন হন হন করে হেঁটে চলল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ছিল রাজকীয়। আমিনের মামা গিয়েছিলেন সদরে

www.pathagar.com

একটা কনফারেন্সে। যাবার সময় রাস্তা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফাঁদে ধরা মস্ত বড় একটা হর্নি স্ট্যাগ। ফরেস্ট অফিসারের উপঢৌকন। বাসায় অতিথ্-মেহ্মান এলে গৌরীসেনদের তৎপরতায় ঐ রকম উপহার-উপঢৌকন নাকি হামেশায় দেখা যায়। হরিণটার নাড়ী-ভূঁড়ি ফেলে গোটাটাই আরবীয় কায়দায় ভাজা-ভাজা করেছেন আমিনের মামী। দুপুরে খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে রোস্ট-করা সেই হরিণের গোস্ত অন্ন-পোলাও সহ আকণ্ঠ ভূরিভোজন সেরে দিয়েছিলাম লম্বা একটা ঘুম। ঘুম ভাঙ্গল স্বপ্নময় একটি সঙ্গীতের আওয়াজে। ঘুমের ঘোরে মনে হচ্ছে কোথায় যেন বেড়াতে গেছি। মেঠো পথে হাঁটছি। সামনে বিশাল একখানি তিসির ক্ষেত। খুব বড় একখানি নীল রঙের চাঁদরে যেন ঢাকা মেঘমুক্ত আকাশই যেন নেমে এসেছে মাটির বুকে। দূরে একটি ছোট্ট পাহাড়। পায়ে চলার পথটি চলে গেছে আঁকা-বাঁকা হয়ে। পাকদন্ডি সেই পথের দু' ধারে বন-তুলসীর ঘন ঝোপ হিল্ হিল্ করে কাঁপছে বাতাসে। একটা গানের সুর ধ্বনিত হচ্ছে আমার মগজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। তার সাথে কেমন মিষ্টি মধুর গন্ধ ভুরভুর করছে নাকের কাছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখি, আমার মাথার কাছে একটি পোর্টেবল রেকর্ড প্লেয়ার। সেই রেকর্ড প্লেয়ার থেকে সঙ্গীতের ঝর্ণাধারা উছলে উছলে পড়ছে। গানের কথাগুলি আমার কানের ভেতর দিয়ে যাকে বলে মরমে যাচ্ছে পশে।

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,

আমি বাইব না আর, আমি বাইব না মোর খেয়াতরী

এই ঘাটে গো ...।

তন্দ্রা কাটতেই আমার প্রায় মূর্ছিত হবার অবস্থা। দেখি, আমার মাথার কাছে একখানি চেয়ার পেতে বসে আছে শিরী। তার শ্যাম্পু করা রেশমী চুলে জংলি বাতাসের ঝাপটা লাগছে। আর তার থেকে বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধের মতন মিষ্টি সৌরভ আসছে ভেসে। শিরীর মুখে কেমন অদ্ভুত হাসি।

আমার ঘুম ভাঙতে দেখে শিরী বলল, কী, ঘুম তবে ভাঙল?

হঠাৎ করেই আজ তিন চার দিন থেকে আমার সাথে শিরীর মাখামাখিটা একটু বেড়েছে। আমার মনে হয় কোন এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে শিরী যেন এই রকম পুতুল খেলার পুতুল হয়ে খেলছে। আর তা তো নিতান্তই স্বাভাবিক। ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকলে বাপ-মা, বিশেষ করে মায়ের মনে কখনো এমনি একটা শখ চাপে বৈকি !

আমার ইচ্ছে হল একবার বলে উঠি, "স্বপন যদি মধুর এমন জাগিয়ো না মোরে জাগিয়ো না।" কিন্তু অত বাড়াবাড়িতে মনটা সায় দিল না। শিরী আমার চেয়ে বয়সে ছোট হয়েও যতখানি স্বচ্ছন্দ হতে পারছে, আমি ওর চাইতে বয়সে বড় হয়েও ঠিক

www.pathagar.com

ততখানি আড়ষ্টতায় জড়িয়ে রইলাম। কৃত্রিম নিরাসক্তির হাই তুলে বললাম, আমিন কোথায়?

শিরী ডান হাতের আঙ্গুলে কপালের চুলগুলো সরিয়ে বলল, আমিন ভাই, বারমুডা গেছে।

—বারমুডা কেন?

—একজন জংলি শিকারীর সাথে দেখা করতে।

—কার সাথে? সাজ্জাদের সাথে?

শিরী একবার বড় বড় চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। পরক্ষণেই তার চোখের বাড়তি জ্যোতিটা কমে গেল। নির্লিপ্ত মুখে সে জবাব দিল, হাঁ, লোকটির নাম ঐ রকমই মনে হয়।

—তাকে পাবে কোথায়?

—আমিই তার সন্ধান দিয়েছি।

—ত্ তুমি? জোর করে জড়তা ভেঙ্গে শিরীকে প্রশ্ন করে বসলাম।

—হ্যাঁ, আমি।

—তুমি তাকে চেন?

শিরী এবার সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকাল। তারপর কী একটা পরখ করে নিয়ে বলল, কেন, চিনব না কেন? একই বনের পশু, একটা আর একটাকে চিনবে না, এমন কি কখনো হয়?

আমি বোকার মতন হেসে উঠলাম, বেশ সুন্দর করে বলতে পারো তো! একই বনের পশু! চমৎকার বিনয়!

শিরী আমার এই প্রশংসার কানাকড়িও দাম দিল না। আমার কথায় যোগও দিল না। কেমন বিরস মুখে জানালা দিয়ে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল বহুদূরের একটা শিশুগাছের কাঁপন-লাগা পাতার দিকে।

আমি বললাম, আজ বনের মধ্যে সাজ্জাদের সাথে দেখা হয়েছিল।

শিরী ফিরে তাকাল কিন্তু কোন কথা বলল না।

আমি আবার বললাম, সাজ্জাদ, দেখলাম, তোমার মাকেও চেনে। সে তাঁর প্রশংসা করছিল।

www.pathagar.com

—প্রশংসা? সে আবার কী প্রশংসা করতে গেল? জংলি ভূতের আবার প্রশংসার খায়েস জাগল কেন?

—না না মন্দ ভেব না মানুষটাকে। আসলে ছেলেটি কিন্তু চমৎকার। তোমার মার হাতের রোস্ট খেয়ে সে ভুলতে পারেনি।

—বুনোটার কথা ছাড়ো। তুমিও আরো দু'দিন থাকো। তুমিও দেখবে আর ভুলতে পারছ না। দ্যাটস দ্যা হিউম্যান নেচার।

আমিও ইংরেজিতে তার কথায় সায় দিলাম। বললাম, দ্যাট্স্ ট্রু। বলেই একটু লজ্জা পেলাম মনে মনে। আধুনিকতার সবদিক দিয়েই শিরী আমার অনেক ওপরে। সেটা তার আর আমার ইংরেজী উচ্চারণের বেলাতেও স্পষ্ট ধরা পড়ল।

শিরী তার মাথার একরাশ ফুলে-ফেঁপে থাকা চুলগুলি দোলাল। তারপর কেমন একটা ফ্যাসফেসে গলায় বলল, আমি তোমার জন্যে বেছে বেছে অনেকগুলি রেকর্ড এনেছি, তোমাকে গান শোনাব বলে।

আমি রসিকতা করতে গিয়ে বললাম, আমি গানই যে শুনি না।

—তাহলে তো মানুষ খুন করতে পারো!

—না, তাও পারি না।

—তবে কী পারো?

—বললাম, মানুষকে শুধু ভালই বাসতে পারি।

—ও, তাই নাকি? তবে তো দেখছি তুমি বড় মহৎ মানুষ। আমাদের মতন কাঁচা বয়েসের মেয়ে মানুষ দেখলে না জানি সে ভালবাসা আবার অন্যভাবে উথলে ওঠে কিনা।

দেখলাম শিরীর চোখে কেমন একটা রহস্যময় তীক্ষ্ণ জ্যোতি বিদ্যুতের মতন ঠিকরে পড়ছে। ঐ দৃষ্টির সঠিক অর্থ বুঝে ওঠা অন্ততঃ আমার যে কম্ম নয়, সেটা আমি নিশ্চিত অনুমান করে খাবি খেতে লাগলাম। আমার এই বিহ্বল দশা দেখে শিরীর মুখে দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল। মনে হল, আমার মধ্যে সে একটা কাটা কবুতরের ছটফটানি দেখছে। মুখে কিছু না বলেই শিরী এরপর রেকর্ড প্লেয়ারটা খুলে দিল।

"জাগরণে যায় বিভাবরী,

আঁখি হতে ঘুম নিল হরি-

কে নিল হরি।

www.pathagar.com

মরি মরি।"

আমি চুপ করে পড়ে রইলাম। অদ্ভুত একটা আনন্দের হিল্লোল আমার সমস্ত দেহ-মনের শিরা-উপশিরায় শিহরণ তুলে বয়ে যেতে লাগল। দু'টি চোখের পাতা আবেশে বুঁজে এলো। গান থামলে যখন চোখ খুললাম চেয়ে দেখি, সমস্ত ঘরখানি শূন্য করে শিরী কখন চলে গেছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, দূরে শিরিষ গাছের মাথায় একটা হাল্কা অন্ধকার সকরুণ বেদনায় গাঢ় হয়ে উঠেছে।

সেই রাত্রিটি আমার বিনিদ্র হয়ে উঠল। আমার মাথার কাছেই পড়ে আছে ক্যাসেট প্লেয়ারটি। টেপটি ব্যাক করে ভয়েসটা একটু কমিয়ে দিয়ে, মেসিনটা চালু করে দিলাম। আবার বেজে উঠল, 'জাগরণে যায় বিভাবরী...'

আমার পাশের খাটে আমিন ছিল শুয়ে। সেও দেখছি জেগে আছে। আমার শিয়রের সেই মিনমিনে গানের আওয়াজটুকু টের পেয়ে আমিন উঠে এলো আমার বিছানায়। তারপর জিজ্ঞেস করল, কি, এত রাতে ক্যাসেট এলো কোত্থেকে?

আমি বললাম, শিরী রেখে গেছে।

সে যেন প্রথম চোটে বিশ্বাসই করতে চাইল না। বলল সত্যি বলছিস্?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

আমিন যেন কেমন গোলমালে পড়ে গেল। স্বগতোক্তির মতন বলল, তাহলে ওর মায়ের কথায় কনভিন্সড হয়েছে দেখছি। গুড্।

—কী সব বলছিস্ বিড় বিড় করে? আমি প্রশ্ন করলাম।

আমিন আমার কথার জবাব না দিয়ে জানতে চাইল, আচ্ছা মামুন, শিরীকে তোর কেমন লাগে?

আমি অকপটে জবাব দিলাম, কেন? ভাল!

—তোর যদি ভাল লাগে তো ওকে তুই বিয়ে কর না?

হঠাৎ আমার মুখে এসেই গিয়েছিল, 'আমি তো এক পায়ে খাড়া।' কিন্তু সহসাই কী মনে করে আবেগটা সামলে নিলাম। বললাম, ভাল লাগলেই যে বিয়ে করতে হবে, এমন কি কথা আছে?

আমিন খানিকটা চুপসে গেল। কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর বলল, তা ঠিক। তবে কথা কি? মামী তোকে খুব পছন্দ করেছেন কিনা!

www.pathagar.com

আমি কী জবাব দেব ভেবে কূল কিনারা করতে পারছি না।

আমিন বলল, তুই বিয়ে করলে তোর ফিউচারের জন্যেও ওরা দায়িত্ব নিতে রাজী আছে।

আমি জানতে চাইলাম, সেটা কেমন?

—মামী আমাকে বলেছে, ছেলেটিকে আমেরিকায় রেখে লেখাপড়ার সমস্ত খরচ বহন করতে আমি রাজী।

আমার বার বার মনে হচ্ছে, এসব আমি কী শুনছি। স্বপ্ন দেখছি না তো?

একটা পরীক্ষা করে দেখলাম। বুঝলাম স্বপ্ন নয়, পুরোপুরি জাগরণের মধ্যেই আছি।

আমিন বলল, শিরীও তোকে যখন পছন্দ করেছে, তখন ভালই হল। তবে সমস্যা একটা যে নেই, তা নয়। সেটা তোরা ইজিলি ওভার কাম করতে পারবি, যদি তোরা স্টেটস্‌এ চলে যাস।

—কেন, সেখানে গেলেই সমস্যা যাবে কীভাবে? আমি লজ্জার মাথা খেয়ে প্রশ্ন করলাম।

আমিনকে সামান্য বিচলিত মনে হল। কিন্তু তারপরেই সে সামলে নিয়ে বলল, দেখছিস তো আমার মামার জঙ্গলের এই সংসার। মনে হচ্ছে না তুই হলিউডে এসেছিস?

আমার তো আধুনিক জীবনযাত্রাই পছন্দ। আমার চারিদিকে আনন্দ-স্ফূর্তির হিল্লোল বয়ে যাক, তাই আমি চাই। মুখে বললাম, টাকা পয়সা থাকলে তো সবই করা যায়।

আমিন মাথার বালিশটাকে একটু উঁচু করে নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে বলল, টু মাচ অফ এনিথিং ইজ ব্যাড!

আমিনের এই দার্শনিক কথা আমার তখন মগজে ঢুকছে না। আমি ক্ষীণ প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললাম, এখন তো প্রগতির হাওয়া বইছে চারিদিকে। প্রগতিশীল মানুষ শহরেই থাকুক আর জঙ্গলেই থাকুক, তারা নিজ রুচিমত সংসার সাজাবেই।

আমিন মুহূর্ত খানিক চুপ করে থেকে বলল, অল রাইট। আমার মনে হচ্ছে প্রগতির কোন কিছু অবদানই তোর জন্যে অসহনীয় হবে না। মামা কাল ফিরছে। তুই চাইলে কথাবার্তা পাকাও করে রাখতে পারিস। আবার বিয়েও করে ফেলতে পারিস। তবে বিয়ে করেই তোকে স্টেট্‌স-এ যেতে হবে। তোর সঙ্গে শিরীও যাবে। তুই রাজী তো?

www.pathagar.com

আমার বারবার শিহরণ হচ্ছে প্রস্তাব শুনে।

আমিন একটু গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, রাত পোহালেই তোকে মামীর কাছে কমিট করতে হবে যে তুই বিয়ে করেই শিরীকে নিয়ে স্টেট্‌স-এ যাচ্ছিস।

—তুই কি পাগল হয়ে গেলি আমিন? আমি মাঝখানে বলে উঠলাম।

আমিন আমার কথা শুনে হতচকিত হয়ে উঠল, টের পেলাম। বলল, কেন? প্রস্তাবের মধ্যে অন্যায়টা কী পেলি শুনি? তারা তাদের মেয়ে-জামাইকে বিদেশে রেখে হায়ার এডুকেশন দেবে। নিজের ট্যাকের টাকা খরচ করেই যখন পাঠাবে তখন তার মধ্যে আমি তো কোন অন্যায় দেখি না।

আমিনের মনোভাবটি আন্দাজ করে আমি তাকে হাল্কা করতে চাইলাম। বললাম, এ রকম একটা প্রস্তাব পেলে কোন্ বোকাটা নারাজ হয়? কিন্তু কমিট করাটা কেন? আমার তো উল্টোটা মনে হয়। বরং তোর মামা-মামীরই তো কমিট করা দরকার। কারণ ব্যয়ভার তো তাঁদেরই বহন করতে হবে।

কথাটি আমিন কেমন বুঝল সেই জানে। খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল। তারপর চিৎ হয়ে শুয়েই কতকটা স্বগতোক্তির মতন বলল, তারা চায় যে তাদের জামাই-মেয়ে পৃথিবীর সবচাইতে আধুনিক সমাজে মানুষ হয়ে উঠুক। সেই সমাজই তাদের কাছে আমেরিকা। ভোগের এই দুনিয়ায় সুখটা তারা নগদই পেতে চায়। "নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকীর খাতায় শূন্য থাক, দূরের বাদ্য হোক না মধুর মাঝখানে তার বেজায় ফাঁক।"

বলেই আমিন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল, ক্যাসেটে ঐ গানটা আছে নাকি রে?

—ঐ যে "প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন ....."

বললাম, কই, শুনিনি তো!

আমিন চুপ করে রইল এক মুহূর্ত। তারপরে সে নিজেই গুনগুন করে খুব চাপা গলায় গাইতে লাগল-

"প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন,

ত বু-উ-উ প্রাণো কেনো কাঁদে রে।"

একটি কলিই দু'তিনবার সে গেয়েছে, ঠিক এমনি সময় আমাদের পাশের দরজায় বাড়ির ভেতর থেকে ঘন ঘন নকিং হতে লাগল।

আমিন ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আমিও ওর সাথে সাথে উঠে বসলাম। আমিন

www.pathagar.com

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াতেই শিরীর মা হাউমাউ করে ডুকরে উঠলেন, বাবা আমিন, আমার সর্বনাশ হয়েছে।

আমিন কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে প্রশ্ন করল, কী হয়েছে?

—শিরীকে ওর বিছানায় পাওয়া যাচ্ছে না।

—পাওয়া যাচ্ছে না? টয়লেটে যায়নি তো?

—না কোথাও নাই। সব জায়গায় আঁতি পাঁতি করে খুঁজেছি।

আমি ধড় ফড় করে বলে উঠলাম, কোন জন্তু জানোয়ারে ধরে নিয়ে যায়নি তো?

শিরীর মা আমার মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে খিঁচড়ে উঠলেন, ড্যাম ইয়োর আইডিয়া!

আমিন কোনদিকেই লক্ষ্য না করে বলল, তাহলে ঐ বদমাশটার কাছেই গেছে, মনে হয়।

—তাই হবে, বাবা! আমি সারাটা রাত্রি জেগে চোখে-চোখে রেখেছি। কখন একটু তন্দ্রামতন লেগে দু'টো চোখের পাতা এক হয়েছে, আর অমনি ধড়মড় করে জেগে দেখছি, বিছানা খালি। শিরী নেই।

আমিন বলল, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। আপনি একটু শান্ত হোন। আমি একটা বিহিত করে আসছি। বলেই সে হ্যাঙ্গার থেকে শার্টটা তুলে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বলল, এই মামুন রেডি হয়ে নে। তোকেও যেতে হবে।

আমাদের রেডি হতে দেখে শিরীর মা সেপ্‌টি বক্‌স খুলে বন্দুক, টুটু বোর রাইফেল আর এক গাদা কার্টিজ আমাদের হাতে তুলে দিলেন। সেই মধ্যরাতে জংলি পথে আমরা দু'টো প্রাণী বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের পাঁচ ব্যাটারী এভারেডী টর্চের আলোয় বুনোপথে আলোর বন্যা বয়ে গেল।

রাস্তায় আমি কতকটা বেহুঁশের মতন আমিনের পেছনে পেছনে ছুটে চলেছি। আমিন যেন ইচ্ছে করেই কথা বলা বন্ধ রেখেছে ভেবে আমার সাহস হচ্ছে না ওকে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করি। বেশ কিছুক্ষণ পর আমিনই আমাকে জিজ্ঞেস করল, কিরে কিছু আঁচ করতে পারছিস?

আমি বললাম, কিচ্ছু না।

—এখন কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—আমি কী করে বলব, তুইই জানিস।

www.pathagar.com

—আমরা এখন সেই সাজ্জাদের বাসায় যাচ্ছি, বুঝলি?

—কেন, সেখানে কেন?

—শিরী ফেল ইন লাভ উইদ্ দ্যাট ইয়াংম্যান।

—বলিস কি?

—যা সত্যি তাই বলছি।

—কিন্তু কদিন ওর ভাব-সাব যা দেখলাম তাতে যে এসব বিশ্বাস করাই কঠিন।

—দ্যাটস দ্যা আউটকাম অব দ্যা মর্ডানিজম। যে সভ্যতার আলোকে সে উজ্জ্বল হয়েছে তারই তো অবদান ঐ অভিনয়। যার ফলে, আমিও ধরতে পারিনি, ব্যাপারটা অত দূর গড়াবে। ধরতে পারলে তোর মনে আঘাত দিতাম না।

আমার খারাপ লাগছিল বটে কিন্তু সে যে সাজ্জাদের কাছেই গেছে, সেটা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। বললাম, এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য লাগছে রে!

আমিন বোধহয় আমার ভুল ধারণাটা ভাঙতে চাইল না। বলল, চল্ চল্ জোরে চল্।

আমরা সাজ্জাদের বাসায় গিয়ে শুনলাম, সে বাড়িতে নেই। ওর ভাই না কে একজন মাঝবয়সী লোক বলল, সন্ধ্যে বেলা সেই যে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে আর ঘরে ফেরেনি। এরকম মাঝে মধ্যেই সে উধাও হয়ে রাত্রিবেলায় কোথায় থাকে। আবার সকাল বেলা ফিরে আসে। কোনদিন তা নিয়ে বাড়ির কারুর চিন্তা-ভাবনা হয়নি। কিন্তু দুপুর রাতে এইভাবে আমরা তাকে অনুসন্ধান করতে গেছি দেখে তিনি চিন্তিত হয়ে নানান কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

প্রথম প্রথম আমিন সবকিছু গোপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে সে সব কথাই ফাঁস করে দিয়ে বলল, মিঃ আজিজের মেয়েটিকে বাসায় পাওয়া যাচ্ছে না। ওর মার সন্দেহ মেয়েটিকে নিয়ে সাজ্জাদই ভেগেছে।

—ইজ ইট? ভদ্রলোক অবাক গলায় বলে উঠলেন। তারপর বললেন, আপ আইয়ে আন্দর মে।

আমিন বলল, এখন তো দেরি করতে পারব না। খোঁজ না পাওয়ার খবরটাও তাড়াতাড়ি বাসায় দিতে হবে। বলে আমরা হতভম্ব লোকটির সম্মুখ থেকে ঝটপট চলে এলাম।

বাংলোতে ফিরে দেখি শিরীর মা উদাস মুখে বসে আছেন খাটের ওপর। ঠিক যেন

www.pathagar.com

একটি পাথরের মূর্তি। আমিন তাঁর কাছে দাঁড়াতেই তিনি একটুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন আমিনের দিকে। আমিন দু'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সেটা পড়ে নিয়ে ঈঙ্গিতে আমাকে বলল, চল্, ওঘরে চল্।

আমরা শোবার ঘরে এলে আমিন বলল, ডু ইউ নো হুয়াট দিস ইজ?

আমি নিরুত্তর মুখে বোবার মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমিন বলল, দিস ইজ ইয়োর ডিসচার্জ লেটার। তোকে এখন আর সেই স্টেট্স-এ যাবার তক্লিফ্ ভোগ করতে হচ্ছে না। দ্যাখ্, পড়ে দ্যাখ্।

শিরীর ম্যাকে লেখা চিঠিখানি পড়ে আমি হতভম্ব হয়ে আমিনের মুখের দিকে তাকালাম।

আমিন প্রশ্ন করল, পালিয়ে গিয়ে কাজটা ও ভালো করেনি? কী বলিস?

আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না।

আমিন বলল, ওর পেটের ছেলেটাকে তোর নামে চালানোর দায় থেকে ও তোকে বাঁচিয়ে দিল, এটা তো ওর বিরাট মহানুভবতা, কী বলিস? সাজ্জাদের ছেলেকে তোর নিজের ছেলে বলতে নিশ্চয়ই তোর খারাপ লাগত, লাগত না?

আমার মুখে কোনই কথা নেই।

আমিন আবার আমাকে প্রশ্ন করল, কি রে, কেমন বুঝছিস? কথা বলছিস না কেন?

আমার তখন সেই মর্ডানিজ্ম্-এর রঙিন ফানুসটার ফুটো দিয়ে ফুরফুর করে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। আমিনের কথার কী জবাব দেব আমি?

www.pathagar.com

বিক্রমপুর থেকে কুলসুমরা যখন ঢাকায় চলে আসে, সেই সময় কুলসুমের বয়স খুবই কম। বড় জোর বছর পাঁচেক হবে। ওর বাপ ওকে খুবই আদর করতেন। কুলসুমকে নিয়ে বাপের মনে ভারী একটা শখ ছিল। সেই ছোটবেলাতেই মেয়ের মুখ চোখ-হাত-পায়ের গড়ন-গাড়ন দেখে বাপের ধারণাটা মজবুত হয়েছিল যে, মেয়েটি তার বয়সকালে অনিন্দ্যসুন্দরী হবে। ধারণাটা জন্মানোর পর থেকেই বাপের মাথায় দারুণ একটা ঝোঁক চেপে বসে। সেই ঝোঁকটা হচ্ছে এই যে, মেয়েটিকে তাঁর যুগের চাহিদা মোতাবেক গড়ে তুলতে হবে। মা কিছুটা রক্ষণশীল ধরনের মহিলা। সেটা তার বংশগত কারণেই হোক, অথবা চারিদিকের অবস্থা দৃষ্টেই হোক, হয়ে গেছে। সেই মানসিকতার কারণেই ঘুম ভাঙ্গার পরে মা মেয়েকে নিয়ে জবরদস্তি একখানা আমপারা পড়াতে বসতেন। আর এদিকে এই সময় ঘন্টাখানিক ধরে বাপ তার মেয়ের ছাড়া পাওয়ার প্রত্যাশায় হাপুস নয়নে চেয়ে থাকতেন। তাঁর উদ্দেশ্যটা ছিল, মেয়েকে ইহকালের চাহিদা মাফিক গুণবতী করে তোলা। পরকাল বিষয়ে মায়ের তয়তদ্বিরটা বাপের কাছে অনেকটা অর্থহীনই মনে হত। কারণ, বাপের মনে 'যেমন কলি তেমন চলি' নামক একটি মহাজন বাক্য বাস্তবিকই দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল।

কুলসুমের বাবা আফসার উদ্দীনের কালো কুচকুচে একটা হারমোনিয়াম ছিল। সেটা সেই কোলকাতা আমলের জিনিস। জীবনের প্রথম দিকে আফসার উদ্দীন কোলকাতার একটি প্রেসের তত্বাবধায়ক ছিলেন। অল্প বয়সে মানুষের কিছু কিছু ভাব প্রবণতা থাকে। একেকজনের মধ্যে সেই ভাব প্রবণতাটা একেকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। আফসার উদ্দীনের সেটি উচ্চমার্গ লাভ করেনি। তার মধ্যে সেই জিনিসটি একটি দুর্বলতার রূপ নেয়। তবে সেই দুর্বলতার চাপে পড়েও আফসার উদ্দীন কখনো আপন স্বাজাত্যবোধটি বিসর্জন দেননি। সে সময় কোলকাতার উঠতি বয়সের যুবকরা মদ্য এবং আনুসঙ্গিক বস্তুটির ব্যাপারে অসাম্প্রদায়িক ছিল। কিন্তু আফসার উদ্দীনের তখনও সাম্প্রদায়িক হিসেবে একটা অখ্যাতি ছিল। মদ কিনতে হলে তিনি স্বজাতির দোকানে যেতেন এবং অন্য বস্তুটিও স্বজাতির মধ্যেই তালাশ করতেন। সেইভাবেই সংগৃহীত এবং পরিচিত একজন সুকণ্ঠী রমণী আফসার উদ্দীনের কী কী গুণে মুগ্ধ হয়ে সেই আবলুস রঙের বাদ্যযন্ত্রটি উপহার দিয়েছিল বছর ত্রিশেক আগে। মানুষের চেহারার কথা মানুষ ভুলে যেতে পারে, কিন্তু কোন একটি স্মৃতি-বিজড়িত উপহার মানুষকে বহু দিন স্মরণীয় করে রাখে। সেই নিয়তেই আফসার উদ্দীন এই আবলুস রঙের হারমোনিয়ামটাকে খুব যত্নের সাথে এতদিন আগলে রেখেছেন। অত্যধিক পরিচর্যার কারণে তিরিশ বছর আগের এই স্মৃতি বস্তুটি এখনও রীতিমত ঝকমক করে।

সেই হারমোনিয়ামটা নিয়ে আফসার উদ্দীন প্রতিদিন সকাল বেলা কুলসুমকে

www.pathagar.com

রেয়াজ করাতেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত তাঁর পছন্দ ছিল না। তার ভেতর বিজাতীয় গন্ধ। নজরুল সঙ্গীত তাঁর একমাত্র আদরের বস্তু, কারণ সেই সঙ্গীতটি তাঁর স্বজাতীয় কবির রচনা। শিল্প বিষয়ে তাঁর দারুণ একটা পরিশীলিত দৃষ্টিকোণ ছিল। তার ফলে কিছু কিছু বিশেষ ধরনের সঙ্গীতের প্রতি তাঁর সীমাহীন মোহ সৃষ্টি হয়েছিল। কুলসুমের মা ফাতেমা খাতুন কুলসুমকে আমপারা পাঠ থেকে অব্যাহতি দিলেই তিনি মেয়েকে নিয়ে ইহলোকের উন্নতির সিংহ দরজাটা খুলবার আয়োজন শুরু করতেন। বহু শ্রমে সংগৃহীত সেই সব শিল্পীত সঙ্গীতগুলি শিখিয়ে শিখিয়ে মেয়েকে যথাসাধ্য পারদর্শী করতে চাইতেন। কিন্তু অবোধ মেয়ের শিল্প বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান না থাকার কারণে, 'কালো ছোঁড়ার কাঁকাল ধরে নাচে মাতাল ছুঁড়ি গো'... প্রভৃতি সঙ্গীতে মুখ টিপে তার হাসি আসত। আর বাধ্য হয়ে আফসার উদ্দীনকে রাগ করতে হত এবং অর্বাচীন মেয়েটিকে ধমকাতে হত। অবশ্যি সময়ের ধোপে অজ্ঞ মেয়ের বোধোদয় হয়েছিল এবং বিদ্রোহী মা ফাতেমা বেগমও সোজা হয়ে গিয়েছিলেন।

বাপের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাও মেয়েটি সঙ্গীতে আশানুরূপ পারদর্শী হয়ে ওঠেনি। সেটার কারণও ছিল। সকালে এই কাজটির জন্যে বাপ আফসার উদ্দীন ঘন্টা খানেকের বেশী সময় করতে পারতেন না। সকালের এই এক ঘন্টা সময় তিনি মেয়ের জন্যে নিষ্ঠার সাথেই ব্যয় করতেন। বাকী সময়টুকু কুলসুমের মা হয় মেয়েকে আমপারা পড়িয়ে, নয়ত সংসারের খুঁটিনাটিতে জড়িয়ে অপব্যয় করে ছাড়তেন। আর বাকী সমস্ত সময়টাই তো মেয়ের স্কুলেই কাটত। সে সময় স্কুলের শিক্ষক মহোদয়গণেরও সাম্প্রতিক কালের মতন সঙ্গীত বিদ্যার প্রতি এত বেশী সচেতনতা ছিল না। এখন যেমন স্কুলে-স্কুলে সঙ্গীতের বা-দস্তুর ক্লাস চালু হয়েছে, পথের মোড়ে মোড়ে নিক্কন, কল্লোল, যান্ত্রিক, হিন্দোল প্রভৃতি সঙ্গীতের স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তখন তো সেসব ছিল না। এই সব হাজারো কারণে কুলসুমের অগ্রগতিটা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল। তবু আফসার উদ্দীনের মনে আশা ছিল, যে বিদ্যেটুকু তিনি মেয়েকে দান করতে পেরেছেন, তার গুণে কোন রাজার দুলাল না হোক, মাঝারি ধরনের কোন এক ধনীর দুলালের আকৃষ্ট হতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। সেই আশাটুকু হৃদয়-মনে জাগরূক রেখেই তিনি যথারীতি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মাঝ পথে এসেই হল ছন্দ পতন। একদিন সঙ্গীত শিক্ষার আসরে বাদ্যযন্ত্র সামনে নিয়েই আফসার উদ্দীনের হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া বৈকল্য দেখা দিল। মেয়েকে প্রবেশিকার দুয়ারে পৌঁছে দেবার আগেই তিনি ইহলোকের দুয়ারটুকু পার হয়ে গেলেন। আফসার উদ্দীনের অন্ধকার জগতে প্রবেশের সাথে সাথেই ফাতেমা খাতুনেরও সারাটা জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল। তিনি এই সোমত্ত মেয়েটিকে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

প্রথম প্রথম গুটি কয়েক দিন ফাতেমা খাতুনের দ্বিধাদ্বন্দ্বে কাটল। হাতের পাতের সব কিছু খুইয়ে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইলেন। কিন্তু শুকনো ডালের স্বর্ণলতার

www.pathagar.com

মতন তিনি অচিরেই টের পেয়ে গেলেন যে, ইহ সংসারে এইভাবে সোজা হওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়।

প্রথমে বন্ধ হল কুলসুমের লেখাপড়া। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফিস বাবদ টাকার অংকটার কথা শুনেই আফসার উদ্দীনের সেই বুকের ব্যথাটা শুরু হয়েছিল। সেই টাকা ফাতেমা খাতুন আর জোগাড় করতেই পারলেন না।

সোমত্ত মেয়ে যতদিন স্কুলে যাতায়াত চালু রাখে, মেয়ের বাপ-মাও ততদিন নাকে সর্ষের তেল দিয়ে নিদ্রা যেতে পারেন। কিন্তু যেই মেয়ের ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় অমনি তাঁদের চোখে সেই সর্ষেরই ফুল ফুটতে শুরু করে। আর যাঁরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমুতে পছন্দ করেন, তাঁরা জোর জবরদস্তি করে গৃহ বনাব স্কুল পর্যন্ত কন্যা নামক শাটেল কর্কটির নিয়মিত যাতায়াতটি জারি রাখেন। তাঁদেরও অবশ্যি চৈতন্যোদয় হয়। তবে দেরীতে। আফসার উদ্দীনের সেটা হবার আগেই তিনি মরে বেঁচে গেলেন আর ফাতেমা খাতুনকে ফেলে গেলেন মহা দুর্ভাবনায়।

ফাতেমা খাতুন অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে শুরু করলেন। মরিয়া হয়ে উঠলেন কুলসুমের বিয়ের জন্যে। রাগ-রাগিনীতে আগ্রহ আছে এমন বেশ কয়েকজন যুবকও এসে একে একে মেয়েটিকে দেখে গেল। বাপের কালের সেই আবলুস রঙের হারমোনিয়ামটা সামনে নিয়ে কুলসুম অনবদ্য ভঙ্গিতে বসে, কাউকে 'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল' আবার কাউকে, 'হে চঞ্চল যাবার আগে মোর মিনতি রাখো', ইত্যাদি বলে খুব মিষ্টি গলায় গানও শুনিয়ে দিল কয়েকটা। কিন্তু বিয়ের বেলায় যে জিনিসটি বিপত্তি সৃষ্টি করল, সেটা হচ্ছে তার পৈতৃক সম্পদের অপ্রতুলতা। আফসার উদ্দীন সংসারে যে শূন্যতা রেখে চলে গেছেন, তার সংবাদ জানতে পেরে সংগীত পিপাসু বিবাহেচ্ছুদের সকল কামনা বাসনা ডানা মেলে শূন্যে উড়ে গেল। ফলে সেদিক থেকে ফাতেমা খাতুনের আশার গুড়ে বালু পড়ল।

বুকে গেঞ্জির ওপর 'আই লাভ ইউ' মার্কা যুবকদের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফাতেমা বেগম অন্য পথে এগোতে চাইলেন। কুলসুমের বাপের এক বন্ধু মাদ্রাসা পাশ একজন যুবককে মেয়ে দেখাতে ডেকে আনলেন। মেয়ে সুন্দরী, আমপারা পড়া, ধর্মে কর্মেও পটু জেনে ছেলেটি কোন রকম উপঢৌকন ছাড়াই বিবাহে রাজী ছিল। ধন-সম্পদের প্রতি তার অন্যদের মত আসক্তি নেই। সে মধ্যপ্রাচ্যের কোন একটি সংস্থার দোভাষীর কাজ করে মাসিক বারো হাজার টাকা রোজগার করে। তার বিশেষ আগ্রহ সৎ, খোদাভীরু, গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা। মেয়ে দেখে তার বেশ পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু বাধ সাধল ঐ আবলুস রঙের হারমোনিয়ামটা। সেটার ইতিবৃত্ত জানবার পর ছেলে যে সেই ভাগল, আর তার পাত্তা মিলল না।

এক এক করে এ পক্ষ, ওপক্ষ সব পক্ষেরই বিবাহেচ্ছুরা সটকে পড়ল। ফাতেমা

www.pathagar.com

খাতুন দুচোখে আঁধার দেখতে লাগলেন। সন্ধ্যে বেলায় মস্তবড় একটা চাঁদ যখন আকাশে উঠে হাসতে থাকে এবং কুলসুম তাকিয়ে তাকিয়ে এক দৃষ্টে সেই চাঁদকে দেখতে থাকে, তখন ফাতেমা খাতুনের বুকটার ভেতর ধ্বক করে ওঠে। মেয়েকে নিয়ে তিনি কী করবেন ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়ে ওঠেন। এক একবার মনে করেন, দেশে চলে যাবেন। আবার পরক্ষণেই ভয়ে তাঁর সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। দিনকাল যা পড়েছে। গাঁও-গেরামের মানুষ সব যে রকম হিংস্র বন্য হয়ে উঠেছে, তাতে সোমত্ত মেয়ে নিয়ে সেখানে বাস করার চেয়ে মরা ভাল। আর তাছাড়া ফাতেমা খাতুনের দেশে আছেই বা কি। কাঠা তিনেক জমির ওপর একটা ক্যানেস্ত্রা টিনের চৌচালা। সে তো সংস্কারের অভাবে এতদিনে মাটির সাথেই হয়ত মিশে গেছে। তবু কোনমতে কুলসুমকে পার করতে পারলে তিনি একলা হাত-পা নিয়ে দেশেই চলে যেতেন। স্বামীর বাস্তুভিটের ওপর বাকী কটা দিন কষ্টে হাত পা ছড়িয়ে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু মেয়েটার যে ভাগ্যই খুলছে না।

দুশ্চিন্তায় ফাতেমা খাতুন যখন হাবুডুবু খাচ্ছিলেন ঠিক তখনই একদিন পুব পাড়ার সুফিয়া বেগম এলো। মেয়েটির সাথে ফাতেমা খাতুনের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত সুফিয়া আগেও মাঝে মাঝে আফসার উদ্দীনের কাছে সাহায্যের জন্যে আসত। আফসার উদ্দীনের মৃত্যুর পর এতদিন সে আর আসেনি। প্রথম চোটে ফাতেমা খাতুন সুফিয়াকে চিনেই উঠতে পারেননি। পরনে তার চোখ ঝলসানো ভারতীয় শাড়ি, কানে মস্ত বড় সোনার ইয়াররিং, কপালে গোলমতন জরির টিপ এবং ঠোঁটে মেজেন্টা রঙের ঠোঁটপালিশ মাখানো সুফিয়াকে ঠিক রাজরাণীর মতন লাগছে দেখতে। ফাতেমা খাতুন কেমন করে চিনতে পারবেন?

ফাতেমা খাতুনের অবাক দৃষ্টি দেখে বুদ্ধিমতি সুফিয়ার বুঝতে বাকী নেই যে মহিলাটি তাকে দেখে বিস্ময়ের ঘোরে পড়েছেন। তাঁর বিস্ময় কাটানোর উদ্দেশ্যে সুফিয়া বলে উঠল, আমাকে চিনতে পারছেন না, খালাম্মা? আমি সুফি!

এবার ফাতেমা খাতুন যেন অকূলে কূল পেলেন, ওমা, তাই নাকি? আমাদের সুফি? আজকাল চোখে তো ভাল করে দেখতে পাই নে, মা! দেখ দিকি কি লজ্জা? ছিঃ ছিঃ!

আসলে ব্যাপারটা যে ফাতেমা খাতুনের দৃষ্টিক্ষীণতার কারণেই নয়, সেটা ভেতরে ভেতরে উভয়ের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুফিয়াই লাজুক মুখে বলল, এরকম কাপড় চোপড় পরে তো আর কখনো আসিনি কিনা, তাই হঠাৎ দেখে আপনি চিনতে পারেননি। কুমু কই?

ফাতেমা খাতুন একবার পথের দিকে তাকালেন। তারপর ছোটগলায় বললেন, কুমু একটু নমিদের বাড়িতে গেছে মা।

www.pathagar.com

—নমিদের বাড়ি! সুফিয়া খাতুনের চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। বলল, সেখানে আবার কেন? ওরা না খেরেস্তান? খালুজী বেঁচে থাকতে তো ও বাড়িতে কাউকে যেতে দেখিনি। ওরা নাকি খবিস টবিস কী সব খায়?

ফাতেমা খাতুন কয়েকটি মুহূর্ত বিমূঢ়ের মতন বসে রইলেন। কী বলবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না। অথচ সুফিয়া বেগমও উৎসুক মুখে চেয়ে আছে। বেকায়দায় পড়ে বললেন, কুমুকে সেখানে আমিই পাঠিয়েছি মা।

—কেন?

—গোটা বিশেক টাকার জন্যে। ওরাই তো এখন একটু দেখা শোনা করে মা। আশপাশের মুসলমানরা তো কেউ ফিরেও চায় না। মেয়েটি কি যেতে চায়? কত বলে কয়ে ঠেলেঠুলে তবে পাঠিয়ে দিলাম। ওর ভারি লজ্জা।

সুফিয়ার মুখখানি বেদনায় থমথমে হয়ে উঠল। বলল, আপনারা বিপদে আছেন জেনেও এতদিন আসতে পারিনি। তখন তো আমারও কিছু করবার ছিল না।

ফাতেমা খাতুন গোলমালে পড়ে গেলেন। তখন কিছু করবার ছিল না, এখনই বা কি করবার হয়েছে মেয়েটার?

ফাতেমা খাতুনের মুখের দিকে তাকিয়ে সুফিয়া বলল, আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, খালাম্মা!

—প্রস্তাব! ফাতেমা খাতুনের চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, কুমুর বিয়ের প্রস্তাব নাকি মা? কোথায়?

সুফিয়া বলল, বিয়ের প্রস্তাব নয়, খালাম্মা! বিয়েটা তো ভাগ্যের লিখন। যখন বিয়ের ফুল ফুটবে তখন ঠিকই হয়ে যাবে দেখবেন।

—তাহলে? ফাতেমা খাতুনের চোখ মুখ এক মুহূর্তে কালো হয়ে গেল। তিনি সুফিয়া বেগমের ঝকমকে শাড়ির চোখ ঝলসানো ধাঁধাঁয় পড়ে বোকার মতন ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে লাগলেন।

সুফিয়া বলল, শুধু শুধু কষ্ট করছেন। কষ্ট করবেন কিসের জন্যে? কুমুকে একটা চাকরীতে ঢুকিয়ে দ্যান। চালাক চতুর মেয়ে, গায়ে-গতরে খেটেখুটে সংসার চালাক। দোষ কি?

ফাতেমা খাতুন বিস্মিত হয়ে বললেন, চাকরী! ওকে আবার চাকরী কে দেবে, মা? কত এম, এ, বি,এ পথে পথে ঘুরছে। ও তো ম্যাট্রিকটাও পাশ করেনি।

—পাশটাশ খুব একটা লাগবে না। ও যা লেখাপড়া জানে তার চে কম লেখাপড়া

www.pathagar.com

জানলেও চলে।

ফাতেমা খাতুন বলে উঠলেন, তাই নাকি? বলেই সুফিয়ার মুখের দিকে একটু লজ্জা মাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, তা যদি হয়, তবে চাকরীটা আমাকেই ঠিক করে দে না, মা! কুমুকে চাক্‌রী বাক্‌রী করতে দেব, আইবুড়ো মেয়ে। এমনিতেই বিয়ে নিয়ে ঝক্কি ঝামেলা হচ্ছে। তখন মুসীবতটা আরো বেড়ে যাবে না?

সুফিয়া হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল, আপনি চাকরী করবেন? আপনার কি চাকরীর বয়েস আছে, খালাম্মা! বয়েস গেলে মানুষের আর চাকরী হয়?

—হয় না? ফাতেমা খাতুনের গলায় নিরাশা ঝরে পড়ল। মনের মধ্যে একটা দ্বিধার ভাব তাঁকে কাতর করে তুলল। দ্বিধাজড়িত গলায় প্রশ্ন করলেন, চাকরীটা কোথায় রে মা?

—চাকরী আমার হাতেই। আপনি যদি রাজী হন তাহলে কালকেই কুমুকে আমি সাথে করে নিয়ে ভর্তি করে দেব। আপনার কোন ভয় নাই। কোন অসুবিধা হবে না।

ফাতেমা খাতুন শঙ্কিতমুখে সুফিয়া বেগমের ঝলমলে শাড়ীটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। চমৎকার লাগছে দেখতে। সুফিয়া চাকরী করছে বলে এত সুন্দর সাজ-পোশাক করতে পারছে। কুলসুমটার এখন আটপৌরে কাপড়ও ছিঁড়ে গেছে। কী করবে, মায়ের তোলা শাড়ীগুলো এখন বাধ্য হয়ে ওকে আট পৌরে করে পরতে হচ্ছে।

ফাতেমা খাতুন আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি চাকরী মা?

—গারমেন্টসে।

—গারমেন্ট! চমকে উঠলেন ফাতেমা খাতুন। মুখখানি তার আরো মলিন হয়ে গেল। তিনি দু' মুহূর্তের জন্যে চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, গারমেন্টের চাকরীতে কী সব শুনি যে!

—কী শোনেন, খালাম্মা?

—ছেলেমেয়েরা নাকি এক সাথে সেখানে কাজ করে?

—তা তো করেই! শুধু গারমেন্টে কেন? এখন তো সবখানে ঐ একই অবস্থা।

—মেয়েরা নাকি ওখানে ঢুকে উচ্ছন্নে যায়?

—এসব আপনাকে কে বলেছে?

ফাতেমা খাতুন করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কত লোকের মুখে শুনি, কার

www.pathagar.com

নাম করব মা?

সুফিয়া বেগম হেসে বলল, মানুষ তো অনেক কথাই বলে, খালাম্মা! মানুষের মুখে হাত দেবে কে? তবে মিথ্যে বলব না। বদনাম একটা হয়েছিল একসময়, একথা ঠিক। এখন আর সে বদনাম নেই। আমাদের কোম্পানীর মালিক গার্মেন্টস নামটাও এখন তুলে দিয়েছেন। এখন আমাদের কোম্পানীর নাম ক্যাপিট্যাল অ্যাপারেল। ওর মধ্যে গারমেন্টস-এর গন্ধও কেউ খুঁজে পাবে না।

ফাতেমা খাতুন চুপ করে এতক্ষণ সুফিয়া বেগমের কথাগুলি শুনছিলেন। হঠাৎ কী মনে করে প্রশ্ন করলেন, জামাই-এর সাথে কী সব গোলমাল হচ্ছিল, তা কি সব এখন মিটে গেছে?

সুফিয়া হেসে উঠে বলল, সেই মুখ পোড়া জানোয়ারটার কথা বলছেন? ওর মুখে আমি ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দিয়েছি।

—মানে?

সুফিয়া বেগম বলতে লাগল, আমাকে গরীব মনে করে সেই জানোয়ারটা দিনরাত আমাকে হেনস্থা করত। তা নিয়ে কতদিন আপনার চোখের ওপরেই খালুজানের কাছে বিচার দিয়েছি। কেউ কি ওর কিছু করতে পেরেছে? কিন্তু আমি যখন এই গারমেন্টে চাকরী পেলাম, সেই মিনসেই তখন আমার পা চাটতে গেল। আমি স্পষ্টাপষ্টি বলে দিলাম, মিনসে রে, তোর ভাত আমি খাব না। তারপরে সে তাই শুনে হাম্বিতাম্বি লম্বাই ফট্টাই শুরু করল। তা দেখে আমার বর্তমান স্বামী ওর দল বল নিয়ে দিল একটা মোটা রকমের ধোলাই। সেই প্যাঁদানির পরে সেই যে পথ ছেড়েছে, আর আমার বাড়িমুখো হয়নি।

—তোমার আবার বিয়ে হয়েছে তাহলে?

সুফিয়ার চোখ মুখে লজ্জার আভা ফুটে উঠল। বলল, বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হয়েই গেল খালাম্মা। ভেবেছিলাম যা হয়েছে হয়েছে, ঐ আদাড়ে আর আমি পা রাখব না। কিন্তু এই লোকটা কিছুতেই ছাড়ল না। আমার সাথেই সে চাকরি করে। মানুষটিও খুব ভাল।

ফাতেমা খাতুন স্বগতোক্তির মতন বলে উঠলেন, বেশ বেশ। ভাল হলেই ভাল। বলতে গিয়েই তাঁর মনের চোখে কুলসুমের মুখখানি জ্বলজ্বল করে ভাসতে লাগল। এ ধরনের চাকুরী যদি কুলসুম পেয়েই যায় তাহলে তারও তো একটা সুরাহা হয়ে যেতে পারে। দুঃখীনি মেয়েটার একটা সুদর্শন স্বামী, সুখী একটা সংসার, কোল আলো করা ফুট ফুটে শিশু।

www.pathagar.com

ভাবতে গিয়েই হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল কুলসুমের দিকে। মেয়েটি নমিদের বাড়ি থেকে এই এতক্ষণে ফিরছে। তাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল মা?

মায়ের কথায় কর্ণপাত না করে সে সুফিয়া বেগমের দিকে তাকিয়ে বলল, কখন এসেছ সুফি বু?

—সেই কখন এসেছি। বোধকরি তুইও গিয়েছিস আর আমিও এসেছি। কী হল, টাকা পেয়েছিস?

—কিসের টাকা? লজ্জা শরমে কথাটা কুলসুম এড়িয়ে যেতে চাইল।

—তুই নাকি ঐ খেরেস্তান বাড়িতে টাকা আনতে গিয়েছিস?

লজ্জায় অধোবদন হয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কুলসুম বুঝে ফেলল, মা তার গোপন জিনিসটি ফাঁস করে দিয়েছে। এখন আর ঢাকতে গিয়ে কাজ হবে না। বলল, গিয়েছিলাম। কিন্তু নমির বাবা বাড়ি নেই। আর নমির মার হাতেও টাকা নেই। টাকা পাইনি।

সুফিয়া এবার হাতের মুঠো খুলে খুব ছোট্ট লাল মতন একটা পার্স বের করল। তারপর কুট করে একটা শব্দ করে পার্সের মুখটা খুলে ফেলল। তার মধ্যে একগাদা কড় কড়ে নোট। সুফিয়া সেখান থেকে বিশ টাকার একখানি নোট টান মেরে বের করে ফাতেমা খাতুনের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন, ধরুন।

—না না, থাক মা, তুমি কেন টাকা দেবে মা গো? বলে ফাতেমা খাতুন আপত্তি করতে লাগলেন।

ফাতেমা খাতুনের আপত্তি উপেক্ষা করে সুফিয়া বলল, এমনি যদি না নিতে চান, তবে ধারই নিন। কুমু বেতন পেলে আমি সেখান থেকেই কেটে নেব। তা হলে তো হবে?

বড় আশ্চর্য সব কথাবার্তা! অন্ধকারের কোন গহীন তলদেশে যেন আলোর বিচ্ছুরণ হচ্ছে। ফাতেমা খাতুনের দুঃখ কষ্টের সংসারে এ যেন এক চিলতে স্বস্তির সম্ভাবনা। আশ্চর্য নয়? ফাতেমা খাতুন হাত পেতে টাকাটি গ্রহণ করলেন।

দ্বিতল বিশিষ্ট ক্যাপিট্যাল অ্যাপারেলের ডনভিউ করিডোর। একটু ফুরসৎ পেলেই কুলসুম এখানে ছুটে এসে দাঁড়ায়। ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসে সুপারভাইজার মনোয়ার আলম চাকলাদার। তারপর দুজন কয়েক মুহূর্ত আলাপচারিতায় মগ্ন হয়। বছর খানেক ধরে দু'জনের মধ্যে অনেক চিন্তা ভাবনা হয়েছে। তারপর আপ্রাণ চেষ্টা করে একটি সিদ্ধান্তে ওরা পৌঁছেছে। ওরা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। প্রথমে দৃষ্টি বিনিময়,

www.pathagar.com

তারপর মিষ্টি হাসি, তারপর লাজুক লাজুক দু'চারটে কথাবার্তা, তারপরেই শুরু হয় ভাবনাচিন্তা এবং সবশেষে এই সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন একদিন ওরা দুজন বেড়াতে গেল বোটানিক্যাল গার্ডেনে। জায়গাটি শুনশান, বড় নির্জন। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর ঐ একটা দিন ওদের অনুপম স্নিগ্ধতায় ভরে গেল।

ঘাসের গালিচায় বসে বসে সেদিন হাজারো পরিকল্পনা প্রণয়নে ওদের সমস্ত সময় দ্রুত কেটে যেতে লাগল।

অনেক কথার ফাঁকে একবার কুলসুম মনোয়ারকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাকি মাথা খারাপ হয়েছিল গো? সত্যি নাকি?

মনোয়ার প্রশ্ন করল, কে বলল তোমাকে?

—কে আবার বলবে, সুফি বুই বলেছে।

মনোয়ার হেসে উঠল। বলল, কথাটা তোমাকে জানিয়ে দিয়ে সুফি বু ভালই করেছে। জেনে শুনে ইচ্ছে হয় বিয়ে কর, আর না হলে সময় থাকতে ছেড়ে ছুড়ে পালাও। সামান্য মাথা খারাপ নয়, একেবারে পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম, বদ্ধ পাগল বলতে পার।

—পাগল? পাংশু মুখে কুলসুম জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ, পাগলই হয়েছিলাম। তোমাকে গোপন না করে সবটা বলে ফেলাই ভাল। ঘরের চাল থেকে টিন বিক্রী করে ফিস জমা দিয়ে বি.এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু পরীক্ষা পাশের পরেই আসল পরীক্ষাটা শুরু হয়ে গেল। একটা চাকরীর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে মাসের পর মাস কেটে গেল। হাজার দশেক টাকা ঘুষ না হলে কোথাও চাকরী মেলে না। চালের টিন বেচে ফিস দিয়েছি। লোকের ছেলে পড়িয়ে ভাত খাই। অতগুলো টাকা আমি কোথায় পাব? চাকরী আর ভাগ্যে জুটল না। এদিকে পথে ঘুরতে ঘুরতেই একদিন খবর পেলাম আমার মা ওষুধ আর পথ্যের অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মারা গেছেন। মার মৃত্যু সংবাদ শুনে বার বার মনে হতে লাগল, এই দেশে জন্মে চোর ও ছ্যাঁচড় না হয়ে গ্রাজুয়েট কেন হলাম? ভাবতে ভাবতেই আমার মাথায় গন্ডগোল দেখা দিল। অনেকদিন পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরলাম। তারপর একদিন একজন চেনা শোনা লোক ধরে এনে এই গারমেন্টে ঢুকিয়ে দিল। চাকরী পাওয়ার পরই আমার মাথাটা সুস্থ হয়ে উঠল। পরে তো সুপারভাইজারেই প্রমোশন পেলাম। এখন আমি ক্যাপিটাল অ্যাপারেলের একজন সুপারভাইজার। এখন আর পাগল হওয়ার ভয় নেই। বলেই মনোয়ার হাসতে লাগল।

www.pathagar.com

মনোয়ারের কথা শুনতে শুনতে কুলসুমের মুখখানা থমথমে হয়ে উঠেছিল। সেটা লক্ষ্য করে মনোয়ার বলল, ঐ সব বাজে চিন্তা ছাড়ো, পাগল টাগল কিছু নয়, বেকার হলে মাথা খারাপ না হয়ে উপায় থাকে? আরে অত ভাবছ কি? আমাদের সেই বাসা ঠিক করার কী হল, সেইটে বল শুনি।

কুলসুম যেন হঠাৎ করে সম্বিৎ ফিরে পেল। বাসার কথা কানে যেতেই বলল, সে ভার আমার ওপর ছিল না তোমার ওপর?

—ও বাব্বা, ভারের এখনই ভাগ বাঁটোয়ার শুরু হয়ে যাচ্ছে, দেখছি!

কুলসুম হাত পা ছড়িয়ে ঠোঁট উল্টে বলল, দেখো, বাসা খোঁজার ভার কিন্তু আমি নেব না। সেটা তোমার ওপর থাকবে। আমার ওপর বিছানা বালিশ-খাট-মশারি আর ঘর সাজানোর সব ভারও তুমি ছেড়ে দিতে পারো। দোরে দোরে 'ঘর খালি আছে গো, ঘর খালি আছে গো' করে বেড়ানো আমার ধাতে কুলোবে না, তা আমি বলে দিচ্ছি।

দুজনে সেদিন অনেকক্ষণ এই সব পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। বাসাটি কী ধরনের হলে ভাল হয়। এক চিলতে বারান্দাও তো থাকতে হবে। গোটা দু-তিন ফুলের টব রাখার জায়গাও দরকার। ঘরটা এখন খুব প্রশস্ত না হলেও চলবে। একটি খাট পাতার জায়গা আর অল্প একটুখানি খোলা মেঝে। ইচ্ছে করলে গোটা দুই বেতের চেয়ার রাখা যায়। তার সাথে একটা সিংগল ড্রেসিং টেবিল। খাটের চাদরটা মনোয়ারকে কিনতে হবে না। কুলসুমের মায়ের বাকসে পুরনো আমলের সুন্দর একটা সুজনি চাদর আছে। মা সেইটেই দিতে চেয়েছে। খুব চমৎকার হবে। গোটা দুই বালিশও পাওয়া যাবে। কুলসুম মনোয়ারকে না জানিয়ে খুব সুন্দর দুটো ঢাকা ড্রাইং-এর পিলোকভার দিন দুই আগেই কিনে ফেলেছে। মনোয়ারের কাছে একটি মাত্র বায়না। খুব ছোট বেলায় বাবা সুন্দর একটা এসেন্স আনতেন কোলকাতা থেকে। অগুরু না কী যেন তার নাম। যে করেই হোক মনোয়ারকে সেই এসেন্সটা ইন্ডিয়া থেকে কিনে আনতে হবে। এরি মধ্যে মনোয়ারের জন্যে কুলসুম তলে তলে বেশ কিছু টাকাও জমিয়ে রেখেছে। একসেট স্যুট করে দেবে মনোয়ারকে। তারপর সেই মধুচন্দ্রিমার দিন সেই স্যুট পরা বুকের ওপর অগুরু ঘষে দিয়ে... ভাবতে গিয়ে কুলসুম লজ্জায় একেবারে রাঙা হয়ে উঠল।

কুলসুমের আরো একটা বায়না ছিল মনোয়ারের কাছে। বলল, জীবনে আর কিছু দাও আর না দাও, কোনদিন মুখ ফুটে আমি চাইব না। বিয়ের দিন একটা ভালো শাড়ি কিনে দিতে হবে কিন্তু, বলে দিলাম।

—মনোয়ার প্রশ্ন করল, তোমার সেই স্যুটের দাম কেমন পড়বে, মনে করো?

—তা ধরো হাজার তিনেক। হবে না তিন হাজারে?

www.pathagar.com

মনোয়ার স্যুটের দাম জানে না। বলল, তা হতে পারে।

কুলসুম পাল্টা প্রশ্ন করল, তোমার সেই শাড়ীর দাম?

—ধরো সেও হাজার তিনেকই হবে। হবে না তাতে?

কুলসুম আজকাল শাড়ীর বাজারের বড় একটা খোঁজ খবর রাখে না, বলল, হতেও পারে।

দুজনে কদিন ধরে নানান কিছু ভেবে চিন্তে অবশেষে বিয়ের একটা দিনও ঠিক করে ফেলল। আগামী পনের তারিখ। এই সপ্তাহেই শুক্লপক্ষ শুরু হচ্ছে। শুক্লপক্ষটা চূড়ান্ত হবে পূর্ণিমাতে। গোলগাল মস্তবড় একটা চাঁদ উঠবে সেদিন। ধবধবে দুধেল জোছনায় ভরে যাবে চরাচর। সেটাই হবে মধুচন্দ্রিমার শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ।

দিন দুই পর মনোয়ারকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ছুটির পর সারা শহর টো টো করে চষে বেড়িয়েও মনের মতন একটুখানি বাসা সে জোগাড় করতে পারেনি। অথচ পূর্ণিমাটা দিন দিন এগিয়ে আসছে হুড় হুড় করে। যদিবা বাসা একটা মেলে তো সাধ্যাতীত ভাড়ার কথা শুনে পিছিয়ে আসা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। কম ভাড়ায় যে বাসা পাওয়া যায়, তাতে কুলসুমের মন উঠবে কিনা ভেবে শংকা জাগে। ওর আবার নানা ধরনের পরিকল্পনা আছে বাসাকে কেন্দ্র করে।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় বিরক্ত হয়ে মনোয়ার কুলসুমকে বলল, নাহ্, হল না। পারলাম না বাসা ঠিক করতে।

কুলসুম হেসে উঠে বলল, বোঝা গেছে মুরোদ। বাসা খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্রেনটা আবার আউট হয়ে না যায়। তখন আমার সাধের মধুচন্দ্রিমাই লাটে উঠবে। তার চেয়ে এখন থেকে দায়িত্বভারটা বদলে নেয়া যাক। আমি বাসা খুঁজতে বেরোব, আর তুমি ঘরে বসে ছোট ছোট কাঁথা সেলাই করবে, হবে ত?

চেষ্টা করে দেখতে হবে। সুচ সুতো এবং পুরোন কাপড়-চোপড় কিন্তু আমার মেসে নেই। কিন্তু সব ছেড়ে ছোট ছোট কাঁথা কেন?

—তুমি একটা আস্ত হাবা। পৃথিবীর সব খবর কখনো জানতে চেয়ো না। এমনিতে মাথার ইস্কুপটা নড়বড়ে। কখন আবার হঠাৎ খুলে গিয়ে... বলে, এক চোট সে দুষ্টু হাসি হেসে নিল। তারপর বলল, হাতে কিন্তু মোটেই সময় নেই। আগামীকাল থেকে আমি দিন কয়েকের ছুটি নেব। এর মধ্যেই বাসা খুঁজে আমাকে বের করতেই হবে। তুমি তো সুপারভাইজার মানুষ। মালিক তেরিয়া হলে সামলে টামলে নিও, কেমন?

পরদিন থেকে কুলসুমের বাসা খোঁজা শুরু হয়ে গেল। সারাদিন অলিগলি ঘুরে ঘুরে

www.pathagar.com

হয়রানির আর শেষ থাকছে না। অথচ পূর্ণিমার আগেই বাসাটার ভীষণ দরকার। মায়ের বাসাতেও বিয়ের পর ওরা উঠতে পারত। কিন্তু সেখানেও নোটিশ পড়েছে। বাড়িঅলা বলে দিয়েছে, বাসা ছেড়ে দিতে হবে। বাসার নাকি সংস্কার করবে। ভাড়াটে তাড়াতে হলে বাড়িঅলারা সেই কথা বলেই নোটিশ দেয়। পূর্ণিমার আগেই সে বাসা ছাড়তে হচ্ছে। অফুরন্ত অট্টালিকার শহরে কুলসুমকে এক চিলতে বাসা যে জোগাড় করতেই হবে। যে করেই হোক।

ভাগ্যের জোরে হঠাৎ করেই বাসা একটা জুটে গেল দিন পাঁচেক পরে। লেকের ধারে ছোট্ট একটা বাড়ি। ওয়াল এবং ফ্লোর পাকা। উপরে টিনের চাল। আঙ্গিনাটা দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা। এক চিলতে উঠোনও আছে। সব কিছু সেপারেট। ভাড়াটা কিছু বেশী। তা হোক কুলসুম ঠিক করেছে, খাওয়া দাওয়ার খরচটা কিছু কাটছাঁট করতে হলেও তা সে করবে। কিন্তু এই বাসাটা কিছুতেই হাত ছাড়া হতে দেবে না। আর এত ভয়ই বা কিসের? শোনা যাচ্ছে আগাম এক দু'মাসের মধ্যেই মনোয়ারের একটা প্রমোশন হবে। শ' দুই তো বাড়বেই তখন আর খুব একটা অসুবিধা হবে না।

কুলসুম এসব কথা মনে মনে ভাবতে ভাবতে বাড়িঅলিকে সাথে করে বাড়ির ভিতর-বার ভাল করে দেখে নিল। কোথায় ফুলের টব সাজাবে, কোথায় এক ঝাড় রজনী গন্ধা লাগাবে তাও এরই মধ্যে ঠিক করে ফেলল। পরিকল্পনার বাড়িটি যেন বাস্তবিকই তার কল্পনার চোখে স্বপ্নপুরী হয়ে দেখা দিল। কুলসুম অত্যন্ত খুশী হয়ে ছোট পার্সটি খুলে আগাম হিসেবে শ' দুই টাকাও বাড়িঅলির হাতে গুঁজে দিল। সব কিছু ব্যবস্থা সেরে বাসায় এসে মায়ের কাছে শুয়ে শুয়ে সে রাত্রি কুলসুমের চোখে এক রত্তি ঘুম এলো না। কুলসুমের বারবার মনে হতে লাগল, বাড়িটা দেখে মনোয়ার সত্যি সত্যি অবাক হয়ে যাবে। ঘরটার পূব দিকে একটা প্রশস্ত জানালা। পূর্ণিমার রাতে এই জানালাটি খুলে দিলে দুধেল জোছনায় সারা ঘর ভরে যাবে। আর সেই সময় অগুরুর গন্ধে ওদের শরীরও ম-ম করতে থাকবে, তখন যা একটা আনন্দ হবে না!

সারারাত্রির বুকভরা আনন্দ নিয়ে কুলসুম সকালে অফিসে যাচ্ছিল। রাস্তায় সুফিয়ার সাথে তার দেখা হয়ে গেল। সুফিয়া এদিকেই আসছিল।

কুলসুম জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছিলে সুফি বু?

—তোরই কাছে।

—আমার কাছে? আমি কালকেই মাত্র বাসাটা ঠিক করতে পেরেছি, সুফি বু। যা একটা হয়রানি গেছে না! কিন্তু যাই বল, চমৎকার একটা বাসা পেয়ে গেছি। সব কিছু সেপারেট। চারদিক খোলামেলা। একেবারে লেকের ধারে। ভাড়াটা একটু বেশী...

www.pathagar.com

সুফিয়া বলল, কিন্তু...

সুফিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে হতচকিত কুলসুম প্রশ্ন করল, কিন্তু কি সুফি বু?

—ক্যাপিট্যাল অ্যাপারেল যে বন্ধ হয়ে গেছে! সুফিয়া ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিল।

—বন্ধ হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। আমাদের আর কারুর চাকরী নেই। মালিক কালকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে সবার চাকরী শেষ...।

কুলসুম মরিয়া হয়ে আবার প্রশ্ন করল, মনোয়ার? মনোয়ার কোথায়?

—কাল সেই নোটিশ পাওয়ার পরে কোথায় যে চলে গেছে, আমার সাথে আর দেখা হয়নি। ওর চোখমুখের ভাবসাব দেখে মনে হল নোটিশ পেয়েই ওর আগেকার সেই অসুখটা আবার ফিরেছে।

সুফিয়ার জবাব শুনে কুলসুম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্বপ্নাবিষ্টের মতন সে দেখতে লাগল, তার মনের আকাশে মস্ত বড় একখানি পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছিল। সহসা মর্মান্তিক একটা ধাক্কা লেগে সেই চাঁদখানি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল। সেই ভাঙ্গা চাঁদের এক একটি ধারালো টুকরো কুলসুমের মনের আকাশটাকে এখন ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

বাপ-মা আদর করে তার নাম রাখতে চেয়েছিল খোকন। কিন্তু বয়সের সাথে সাথেই খ-এর শরীর থেকে ও-কারটি ঘুঁচে গিয়ে হ্রস্ব উ-কার হয়ে গেল এবং একটি অপ্রয়োজনীয় চন্দ্রবিন্দুও উঠল তার মাথায়। খোকন হয়ে গেল খুঁকা। সবাই তাকে এখন খুঁকা বলে ডাকে। খোকন নামটির মধ্যে বেশখানিক একটা পেলবতা ছিল লুকিয়ে। এখন তার সবটুকু উঠে গিয়ে কেমন অমসৃণতা খসখস করছে। খুঁকা বলে ডাকলেই সেটা টের পাওয়া যায়। বোঝা যায় ওটা কোন নধর চিক্কন-নাদুস-নুদুস ব্যক্তির নাম নয়। শুকনো প্যাকাটি মানুষের নাম।

আসলেও কিন্তু তাই-ই। খুঁকার শরীরটি সত্যি সত্যি জীর্ণ-শীর্ণ। কতকাল যে মাথার চুলে তেল পড়েনি এক ফোঁটা, তার হিসাব-নিকাশ নাই। চুলে তেল লাগাবে কি, ডাল-সালুনেই তেল জোটে কি জোটে না-এমনি টানা-কষার সংসার। গায়ে হাফ হাতা একটা ফতুয়া। কোন্ দাদার আমলের তৈরী। গাঢ় ছাই রঙের মিলিশিয়া কাপড়ের সেই জামাটিতে এখন আসল রঙের চিহ্নটিও নাই। ছিঁড়েছে বহু জায়গায়, কিন্তু ছিঁড়েও নিস্তার নাই। যেখানে ছেঁড়ে সেইখানে চট্ করে একখানি 'ডাবটি' পড়ে। সেই 'ডাবটি'র জন্যে কাপড় এবং রঙ নিয়েও কোন বাছ-বিচার করে না সে। বাজারে আলী আকবর দর্জির একটা সেলাই-এর দোকান। তার বাঁশের রেলিঙ-এর পাশেই লাল-নীল-শাদা-সবুজ নানা রঙের এবং হরেক কিসিমের ছাঁট-ছুঁট পড়ে থাকে ডাঁই হয়ে। সেখান থেকে গাদাখানিক কুড়িয়ে আনলে আলী আকবর না করে না। কত লোক নিয়ে যায়! এস্তেঞ্জার কাজে ব্যবহার করে। আর খুঁকা তো তার চেয়ে একটু ভাল কাজেই লাগাবে। না করবে কেন?

খুঁকার পেশারও নাই সংখ্যা সীমা। কখনো কারুর বাড়িতে ফাই-ফরমাস খাটে। গেরস্থের জমিতে নিড়ানি দেয়। ফসল কাটার সময় ফসল কাটে। লোকের 'ধারি'তে মাটি তোলে। ধারি বাঁধে। আখ মাড়াই-এর কল বসলে রাত জেগে রস, গুড় পাহারা দেয়। শিয়াল-কুকুর তাড়ায়। মাছ বেচার মওসুম শুরু হলে মাথায় করে ইলশাও বেঁচে বেড়ায়। যেমন সীমা-সংখ্যাহীন তার পেশা, তেমনি নিদারুণ অসচ্ছলতাও জেঁকে বসে আছে তার সংসারে। সেই অসচ্ছলতায় হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে, লোকে বলে, সে নাকি মাঝে-মধ্যে চুরি-চামারীরও চেষ্টা চালায়। সিঁদ কাটে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই সেই প্রচেষ্টা তার সার্থক হয় না। সে চোর হলেও বড্ড নাকাম চোর।

খুঁকার মাথার ঘাম পায়ে পড়ে প্রচুর কিন্তু সেই ঘামের বিনিময়টি সে পায় যৎসামান্যই। খুঁকাদের মূল্যই কম। যার পেটে সর্বদা ক্ষুধার আগুন জ্বলে, তাকে তড়িঘড়ি করেই সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে হয়। আর সেইটেই অন্যদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। যে জিনিস বিক্রি হবার জন্যে অস্থির, তার বাজার দর তো

www.pathagar.com

কমবেই। খুঁকারা সব সময়ই সহজ লভ্য। তাই মাগ-ছেলের মুখের দু'মুঠো ভাত আর লজ্জা ঢাকার সামান্য বস্ত্র জোগাড় করতে গিয়ে সে হিমশিম খায়। মাছিরনের লজ্জা ঢাকার এক টুকরো কাপড়ের জন্য আবদারের অন্ত-নাই। যে খাওয়া-পরার দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে একদিন আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করে খুঁকা মাছিরনকে ঘরে এনেছে, সেই দায়িত্বের কোনটাই তো সে ঠিক মতন পালন করতে পারে না। পেটের জ্বলুনিটা মানুষের চোখে পড়ে না, কিন্তু শরীরের লজ্জাটা? সেটা ঢাকতে না পারলে লজ্জায় কি চোখ খোলা যায়? মাছিরন একখানি মাত্র কাপড় দিয়ে দিন গুজরান করে। গা ধুতে হলে ঐ কাপড়ের আধখানা দিয়ে শরীর ঢেকে বাকী আধখানা রোদে দিয়ে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

এমন দুঃসহ কষ্ট আর সয় না মাছিরনের। মাঝে মাঝেই খুঁকাকে সে তাকিদ লাগায়, একখানা মোটা কাপড় হলেই তার নিদারুণ কষ্টটির লাঘব হয়।

খুঁকা ঐ তাকিদে কান দেয় না মোটে। কান দিলেই ফ্যাসাদ বাড়বে। ভেলু শা-র কাছে ধার করা টাকায় তার মাছের ব্যবসা। ভেলু শা চড়া সুদ কাটে মাসান্তে। লাভের গুড় পিঁপড়ারই পেটে যায়। তার ওপর চালানের ওপরই যদি হাত পড়ে, মরণ ছাড়া গতি আছে? খুঁকা নির্লিপ্ত মুখে গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

—কানে কুড়ি-কুষ্টি হয়েছে। শুনতি পায় না মোটে।

মাছিরনের চিলের মতন গলাটি বেজায় চিক্‌কার দিয়ে ওঠে। খুঁকার কানের তালার মধ্যে ঝনঝন করে বাজে তার আওয়াজ। মাছিরন বলে চলে, গতর ঢাকার একখান কাপুড় তাই দিবার যার ক্ষ্যামতা নাই, তার বিয়ে কত্তি হাউশ হইয়েল ক্যানে?

খুঁকার গা জ্বালা করে ওঠে। ক্যান হাউশ্ হইয়েল শুন্‌তি চাস? তুই যে আনিমাতা ভবানী হয়ে যা'তেছিলি। আমি তোর সেই পথে কাঁটা দিতি চায়েলাম, বুঝলি? আজার বিটি তুই আনি হয়ে আজবাড়িতে উঠতিক তো। তোর মা যেমুন হয়েছে আনিমাতা আসমনি....

আধখানা কাপড় বরই ডালে আর বাকী আধখানা শরীরে নিয়ে মাছিরন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল উঠোনে। রাগে তার সর্বাঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। রাগের মধ্যেই সে সতর্কভাবে ভেজা কাপড়ের অর্ধেকটা খুলে নিল বরই গাছ থেকে, যেন সাময়িক রাগের কারণে একমাত্র পরিধেয়টির কোন ক্ষতি না হয়ে যায়। তারপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে এবার বাজখাঁই গলায় চীৎকার করে উঠল, আমার মা-রে নিয়ে মত্তি বসিছে ক্যানে? মরা মানুষডা কি পাকা ধানে মই দিছে কু'ম্‌টি মিন্‌সের? উয়ার মা মাগী তো আজার মাগ আনি ছেল। ওরে আমার আজপুত্তর রে! আমারে আগাতে আসে না য্যান, কলাম। কেঁচি তুলতি সাপ উঠায়ে দিবানে। কথায় আছে না? যার হাতে খাইনি সে বড় আঁদুনি, যারে দেখিনি সে বড় উপসী...

www.pathagar.com

গোপন কোন্ এক সাপ উঠানোর ভয়েই হয়ত, সাপের মাথায় গাছ ছোঁয়ালে যেমনভাবে দুরন্ত কেউটের মাথাটি নুইয়ে আসে, ঠিক তেমনি করে খুঁকার মাথাটিও আস্তে করে নুইয়ে পড়ে। হাতের কাছে একটি ভাঙ্গা খালুই ছিল পড়ে, সেইটের সংস্কারে এবার সে অখন্ড মনোযোগ নিবিষ্ট করে। এভাবে দু'তিন মিনিট গেলে হাতের চটাখানি মাটিতে রেখে সে মাছিরনের দিকে তাকায় এবং মাছিরনের ভেজা জবজবে কাপড়ে লেপ্টানো বেহাল শরীরটি দেখে বেহায়ার মতন দাঁত বার করে হাসে।

হাসি দেখে মাছিরনের পিত্তি জ্বলে যায়। সে আর খুঁকার দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতেই পারে না। রাগে গজ গজ করতে করতে সেখান থেকে দূরে যেতে চায়, কিন্তু জীর্ণ চালা ঘরটি তাদের এতই সংকীর্ণ যে স্বামীর ওপর ক্রুদ্ধ নারীটির একটু আত্মগোপনের ঠাঁইও জোটে না। বাধ্য হয়েই বেহায়া খুঁকার দিকে পিঠ দিয়ে সে গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

খুঁকা ভেজা বেড়ালের মতন পিট পিট করে তাকায়। কথা বলার জো পেয়েই সে বলে ওঠে, দাঁড়া ইবার, তোর কাপুড় কাপুড়... ইবার যিতি কাপুড় আমি না আনি তা'লে....

কথা বলার ভীষণ অনিচ্ছা ছিল মাছিরনের। কিন্তু এমন মওকা মতন কথার জবাব না দিয়ে মোটেই থাকা যায় না। বলে, কাপুড় আর উয়াকে আনতি হবি নে। পিন্ধনে যা আছে তাই দিয়েই ফাঁস লাগায়ে মরবানে। লতুন কাপুড়ে আমি বাসি আখার ছাই দিবানে।

কথাটি শুনে এই জটিল সময়েও খুঁকার মনে রসিকতার সাধ জাগে। সে দাঁত বার করে হাসে আর বলে, তোর ঐ পচা কাপুড়ে ধুমসি গতরের ভর রাখপিনি রে বৌ। ধপাস ক'রে প'ড়ে কেলেমকারী বাড়বিনি একখান। উ কামডা তুই কত্তি যাস্ নি।

মাছিরনের রাগে পিত্তি জ্বলে যায় দ্বিগুণ। সে উল্টা মুখেই বসে গজরায়, আমি মরলি তো আখামুইখি কুমটি মিন্‌সিডার পেরানে ছান্তি হয়। লতুন আর একটা মাগী আইন্যে উয়ারে 'আনী' বানায়ে পায়ে ত্যাল মাখাতি পারে। আমার মরণডাই তো উ চায়।

খুঁকা আবার খানিকটা নির্লিপ্তই হয়ে পড়ে। অযৌক্তিক কথাবার্তার জবাব দেওয়া নিরর্থক। মাছিরনের আজগুবি অভিযোগের কি কানকড়িও মূল্য আছে? নতুন একটা মেয়েলোককে রাজী করে এই সংসারে বসবাসের জন্যে আমদানী করা হয়তো দুঃসাধ্য কাজ নয়। কারণ, এই দেশে অমন মেয়েলোক হর-হামেশাই পাওয়া যায়। কিন্তু অভিযোগের দ্বিতীয় অংশটি? অর্থাৎ সেই মেয়েলোকটিকে রাণী বানানো এবং তার খস খসে পদযুগলে মাগগী গন্ডায় তেল কিনে মাখানো, আদৌ কি একটা যুক্তিসংগত কথা? সুতরাং অমন একটা যুক্তিহীন কথায় কর্ণপাত করা অর্থহীন ছাড়া আর কিছু নয় ভেবে খুঁকা খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। তারপর, কখন একটা জুৎসই কথা বলে মাছিরনের অভিমান-উত্তপ্ত মনটিকে একটু শীতল করা যায় তার সুযোগ খোঁজে।

www.pathagar.com

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায় নির্বাক। এক সময় খুঁকা স্বগতোক্তি করে ওঠে, সুনা মিয়া হাজীর বাড়িত যাকাতের কাপুড় দিবে কাল শুনতিছি। যাতি পাল্লি কাম হতোক। কিন্তুক যাওয়ার সুমায়ডা কত্তি পাল্লাম না।

মাছিরন নড়ে চড়ে বসে। সোনা মিয়ার বাড়ির যাকাত বন্টনের সংবাদ সে আগেই শুনেছে। লাইনে টিকে থাকতে পারলে একখানি মোটা কাপড় পেয়ে যাওয়ার নির্ঘাৎ সম্ভাবনা। গত বছরের আগের বছর একখানা সে পেয়েছিল কোরা কাপড়। চওড়া খয়েরি পাড়। মজবুত কাপড়টি বছর খানেক ধরে সে পরতে পেরেছিল। কিন্তু গতবার মানুষের ভিড়ের চোটে লাইনে টেকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গিয়ে আর লাইনে দাঁড়াতে পারেনি মাছিরন। এবারও সে ভয় আছে। তবে সে এবার শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিছুতেই লাইন ছাড়বে না। এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই মনের আগুন অনেকখানি 'দুব্‌লা' হয়ে পড়ে। কাপড় কেনার কথাটি যে খুঁকার আস্ত 'ফাট্‌কি' সে বিষয়ে তার বিন্দু-বিসর্গও সন্দেহ নাই। কিন্তু যাকাতের কাপড়ের কথা নির্জলা সত্য। সে কথায় এক জাররাও মিথ্যা ঢোকায় নাই খুঁকা।

ধীরে ধীরে মাছিরনের এই যে মানসিক পরিবর্তন ঘটছে, তার সবটুকু আঁচ করতে খুঁকার সেকেন্ড কয়েকের বেশি সময় লাগে না। একসঙ্গে অনেকদিন ধরে ঘর-সংসার করতে করতে খুঁকা এই মেয়ে মানুষটির রগ-রেশা ভালভাবেই চিনে ফেলেছে। সেই অভিজ্ঞতায় ভর করেই সে জিজ্ঞেস করে, কি রে যাবি না কি?

মাছিরন কোন কথা বলে না। চুপচাপ বসে বসে উসখুশ করে ভেতরে ভেতরে। এমনি ধরনের ত্যক্ত-বিরক্ত মেজাজ নিয়ে চট করে রাগ ভেঙে কথা বলাটা মাছিরনের জন্যে শোভন নয়। সে আরো একটু সময় অপেক্ষা করে, যেন খুঁকার মুখে আরো দু'একটি মান-ভঞ্জনের মিষ্টি কথা শুনতে পাওয়া যায়।

—শোনলাম হাজী বাড়ি ইবার কাপুড়ের গাঁ'ট আসেছে ম্যালা। মাতা পিছে দু'খেনেও দিতি পারে।

খুঁকা মাছিরনের উৎসাহটা চাঙিয়ে দেয়। যাতি পাল্লি ভালো হতোক। কিন্তুক মুশকিল হইছে একটা। পেরসিডেন আসতিছে নূর পুরে।

মাছিরনের উসখুশটা বেড়ে যায়। প্রেসিডেন্ট আসছে তো/তাদের কি? এদিকে একখানা কাপড় পাওয়া কি সোজা কথা? একেবারে আসমানের চাঁদ হাতে পাওয়া। চাঁদ হাতে পাওয়া কি? চাঁদ দিয়ে কী করবে মাছিরন? এক লক্ষ চাঁদ পেলেও মাছিরনের কোন লাভ নাই। তার দরকার একখানি কাপড়। লজ্জা নিবারণের এক টুকরো বস্ত্র। তার সারা শরীরে আল্লাহ যে লজ্জা দিয়েছে মাখিয়ে, তার ওপর একটু আবরণের জন্যেই মাছিরন লালায়িত। সেই লজ্জা ঢাকার এক টুকরো মোটা 'বস্তর'

www.pathagar.com

পেলেই তার চলে। মাছিরনের রাগটা আরো খানিকটা থিতিয়ে আসে। বারান্দায় গোটা চারেক মুরগীর বাস্তা অনেকক্ষণ ধরে কুঁই কুঁই করছে। হাত নাড়া দিয়ে সে সেগুলোকে তাড়া মারে। খুঁকা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারে মাছিরনের মুখ ফুটতে আর বেশি বিলম্ব নাই।

খুঁকা বলে, চিয়ারম্যান সাব কলেন, ভুরকামারি হুনে বাস যাবি, সে তুমার গি', হাজার হাজার বাস। দ্যাশের আজা আসতিছে ভমনে, ম্যালা মানুষ-জন হাজির কত্তি হবি। বাস লাগবি না? একটা লাল পাইও ভাড়া লাগতিছে না।

মাছিরনের ইচ্ছা হয় সে জিজ্ঞেস করে, কে দিবি ভাড়া? কিন্তু তার আর প্রয়োজন হয় না।

খুঁকা বলে, চিয়ারম্যান সাব কলেন, সব মানুষের ভাড়া তিনার পকেট থা'কে যাবি। খালি তাই? নাস্তাপানি খাওয়ার জন্যি ট্যাকাও দিছে। বলেই ট্যাঁক থেকে দশ টাকার একখানি কড়কড়ে নোট বার করে সে দেখায়।

নোটের আওয়াজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মাছিরনের। সে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখে নেয়। তারপর আবার উল্টা মুখে বসে থাকে।

—আরো মজার কতা। চিয়ারম্যান কলেন, আমাদের নাকি খাস জমি বন্দোবস্ত দিবি। খুঁকা খুশীতে আকর্ণ হাসে।

মাছিরন আর গাম্ভীর্য টিকিয়ে রাখতে পারে না। আকস্মিক একটু নড়ে চড়ে বসে। বলে, জমি না আইঠ্যা কলা দিবি। বলে সে উল্টা মুখেই বসে থাকে।

উল্টা মুখ হোক আর সোজা মুখ হোক, মাছিরনের জবাবটি কিন্তু খুঁকারই কথার। রাগ যে তার পনের আনাই গেছে, সে কথাটি বুঝতে খুঁকার আর বাকী নাই। খুঁকা শান্ত গলায় বলে, অ্যাই, একটা ভুল কতা কলি রে বৌ। দ্যাশের পেরসিডেন, তুমার গি সে হলো দ্যাশের-আজা। অম্‌ধারা মানষে কি মিথ্যি কতা কতি পারে?

মাছিরন গোপনে জিভ কাটে। এই অন্যায় ধারণাটির জন্যে তার খুব লজ্জাবোধ হয়। দ্যাশের 'মাথা' যে মানুষ তাকে মিথ্যাবাদী ভাবা কি নিদারুণ অন্যায় নয়? মাছিরন মনে মনে আল্লার কাছে মাফ চায়। সাথে সাথে জমি দেওয়ার কথায় তার আনন্দও হয় খুব। সেই খুশীর চোটে মনটি তার তুলার মতন নরোম হয়ে পড়ে। খুঁকার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভিজা কাপড়ের ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সে ফিক্ করে হেসে ওঠে।

খুঁকা বলে, গাঁয়ের বেবাক মানুষকে যাতি হবি। সকাল সকাল না গেলি আর বাসে জা' গা পাওয়া যাবি নানে।

—এত মানুষ যাতিছে ক্যানে? সগ্‌গলকেই কি জমি দিবি নাকি?

www.pathagar.com

—তুই একটা গা...বলে ঢোক গেলে খুঁকা। আর একটু হলেই মুখ ফসকে মাছিরনকে একটা গা'ল দিয়ে ফেলেছিল আর কি। সদ্য মান ভাঙা বৌ। কথার উল্টা-পাল্টা ধরা পড়লে আবার কোন ফ্যাসাদ বেঁধে যায় কে জানে! বলে, তুই একটা ছেলি মানুষের মুতুন কতা কলি, মাছি। পেরসিডেন আলি দেখাতি হবি না? না হলি চিয়ারম্যান সাবের চাকরি থাকপি? মানুষে ছাতু খাতি চায় না কিনা, তাই ট্যাকা ঢাল্‌তিছে ম্যালা। পকেট ভর্তি তাড়া বাঁধা নোট রে বৌ। তুই হাত পা'তি দাঁড়া, অমনি পায়ে যাবি একখান।

—ট্যাকা নিয়ে না যিতি যায়?

—ইহ্, পাইছে মামুর বাড়ির কদু! নূরপুর গিয়ে চেক করবি নি? সিখানে না পা'লি গাঁয়ে আ'সে ছ্যাঁচন....। বাপ-সুমুন্দির নামডা ভুলায়ে ছাড়বি নি? সুজা পাইছে? বলতে বলতে খুঁকা ওঠে দাঁড়ায়। তারপর প্রবল একটা আড়মোড়া ভাঙে। রাগারাগির পর নিত্যদিন যেমন মিটমাট হয়ে যায়, খুঁকা বুঝতে পারে, তেমনি মিটমাটের সব রকম লক্ষণই এখন দেখা যাচ্ছে মাছিরনের মধ্যে। সেই সুযোগে সে বলে ওঠে, তুই এক কাম কর বৌ। সুরি আর গুলাপীকে সাঁতে নিয়ে হাজি বাড়ি যা। 'বোড়্ বিহিনে' ম্যালা মানষে যাবিনি। কারুর সাঁতে যাতি পাল্লি স্যাখুন লাইন দিতি পারবি।

মাছিরনের গলায় এখন আর চিলের সেই চিক্‌কার নাই। শান্ত মিহিন গলায় সে বলে, তুমি সাঁতে গেলিই তো ভাল হোতোক।

ব্যস, মানভঞ্জনের পালা শেষ! খুঁকার ভাব-সাব আবার নির্লিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে, আমার সুমায় নাই। পেরসিডেনের সাঁতে দেখা করা থুয়ে তুমার সাঁতে যাতি হলিই কাম শ্যাষ।

মাছিরনের বুকের ভেতর ছ্যাঁক করে ওঠে। কাম শ্যাষ। অর্থাৎ সামান্য যাওয়ার সেই কষ্টটুকু করতে পারলেই যে বিপুল ধন-ভাগ্যের সম্ভাবনা, সেই ভাগ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অতবড় লোকসানের কাজ খুঁকাকে কেন করতে বলবে মাছিরন? বরং দু'টো কাজই তাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। সরকার ভূমিহীন কৃষকদের জন্যে জমি বন্দোবস্ত দিচ্ছেন। সে জমি তো মাছিরনের সংসারে স্বচ্ছলতার সুবাতাস বয়ে আনবে। কত বিঘা জমিই যে তাদের ভাগ্যে জুটে যায়, কে জানে? পাঁচ-দশ বিঘার তো কম নয়। আবার বেশিও হতে পারে। জমি পেলেই খুঁকাকে দিয়ে হাল বলদ করবে মাছিরন। এখনকার এই হরেকরকম কাজ কাম থুয়ে তখন এক কামে নামাবে তাকে—চাষ কাজ। মাঠে মাঠে মাছের পিত্তির মতন যে ধানের চারাগাছ দেখা যায়, মাছিরনের জমিতেও বেড়ে উঠবে সেই চারা ধান গাছ। সেই ধান পাকবে। সোনার ধানে ভরে উঠবে ঘর। আজ দুটো ভাতের অভাবে সংসারে যে টানাকষা, তা আর থাকবে না তখন। ভাতের মিষ্টি গন্ধে মৌ মৌ করবে বাড়ির চারদিকের বাতাস।

www.pathagar.com

—আমারে তুমি থুয়ে আস্‌তি পার না? অনেক চিন্তার ভিড়ের মধ্যেও মাছিরনের মুখে অজ্ঞাতসারেই কথাটি এসে যায়।

খুঁকা ঝনঝনিয়ে ওঠে, আমারে তুই কহকুভুল পঙ্খী পালি নাকি?

চমকে ওঠে মাছিরন। রূপকথার কাহিনী বলাতে খুঁকা বড় ওস্তাদ। যখন সে 'আজপুত্তর' আর 'আজকন্যে'র কাহিনী শুরু করে, পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই বাস্তব দুনিয়ার কথা ভুলে ওর চারপাশে বসে কাহিনী শুনে। ধান মাড়া 'খোলা'য় ভাদরের বাঁধভাঙা জোছনায় 'খাজুর' পাতার পাটি বিছিয়ে বসে, কহকুভুল পাখির পিঠে চড়িয়ে 'আজ পুত্তুর'কে আকাশ সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে কত যোজন যোজন দূরে, সাত সমুদ্দর তের নদীর পারে 'চন্দরাবতী আজ কন্যের' 'গিহে'। রাক্ষসের ঘরে বন্দী রাজকন্যা দিন গোণে রাজপুত্তুরের জন্যে, চোখের জলে ভেসে ভেসে। তারপর সত্যি সত্যি এক সময় উদ্ধার পায় রাজকন্যা। মহামিলনের শুভলগ্ন ঘনিয়ে আসে। খুঁকা বাম কানে বাম হাতের তালু চেপে সেই মহামিলনের ভূমিকা শোনায় গান দিয়ে, ছিঁড়া ছাতি, ছিঁড়া পুঁতি হে... ও না ঘটক চলে পথে....

আহা, সেই কহকুভুল কি মানুষের জীবনে কখনো মেলে?

মাছিরন বাঁকা চোখের চাবুক হেনে বলে, হ, তুমার কহকুভুলই একটা দিতি হবি ইবার আমারে।

—দিবানে, বলেই সুর করে সে গেয়ে ওঠে,

ও বৌ আর করিস না মন ভারি,

কুষ্টে থাইকে আইন্যা দিব দশ ট্যাকাই হাওয়াই গাড়ি....

মাছিরন মুখ ঝামটা মারে। কিন্তু দিলে দিলে বড্ড খুশী হয়। অনেক অপূর্ণ সাধই এবার পূর্ণ হবার সুযোগ আসছে। বলুক না যা বলতে চায় মানুষটা।

প্রতীক্ষার রাত্রিটিকে বড় দীর্ঘ মনে হয়। সারারাত্রি দু'টি প্রাণী ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে শুয়ে আগামী দিনের স্বপ্নজাল বোনে। সুখের স্বপ্নজাল। জীবনের সীমা সংখ্যাহীন অপূর্ণতার দুঃখ-বেদনা তলিয়ে যায় সুখ-সরোবরে। সেখানে ফুটে উঠতে থাকে আনন্দের একগুচ্ছ শ্বেতকমল। সেই সুখের একটা মিষ্টি অনুভূতি তির তির করছে মাছিরনের বুকের ভেতর। ওপাশে শুয়ে আছে গুলাপী আর সুরিয়া। দু'টি মেয়েই ঘুমে বেহুঁশ। বাপ-মার মনের এই সুখস্বপ্নটি ওদের মনে সংক্রমিত হতে পারেনি। হলে ওরা অমন করে ঘুমুতে পারত না।

খুঁকা অনেকক্ষণ ধরে পড়েইছিল। হঠাৎ শরীরটা তার একটু একটু নড়ে উঠছে।

www.pathagar.com

এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল, রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে উড়াল দিয়ে ছুটে আসছে একটা কহকুভুল পাখি। পাখিটা বন বন করে ডানা ঘোরাতে ঘোরাতে নামল এসে নূর পুরের মাঠে। পাখির পেট থেকে বেরিয়ে এলো এক দেখনেঅলা 'আজপুত্তুর'। পাশে পাশে ডানাকাটা পরীর মতন এক 'আজকন্যা'। বাপরে বাপ্ কী 'উপ্ যইবন'! কী খায়, কী পরে আর কী মাখে 'শরীলে' যে 'বুঁয়াসের' ট্যার পাওয়াই মুশকিল! আরে ইডা কী কতা! সবাই ছুটেছে 'আজা-আনীর' দিকে। খুঁকার পা কেন ওঠে না? বুকে তার কীসের বোঝা চাপানো। দম নিতেই কষ্ট হচ্ছে যে! হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। জেগে সে লক্ষ্য করে, মাছিরনের ডান হাতখানি কখন অজান্তে তার বুকে এসে পড়েছে। মাছিরনও ঐ 'আজকন্যের' মতন একজন নারী। হাত-পা-মাথা-গা তার মতন সবই আছে মাছিরনের। নাই খালি 'অদেষ্ট'। আর তাই খুঁকার সংসারে পড়ে দু'মুঠো ভাত আর এক টুকরো কাপড়ের জন্যে কষ্টের তার সীমা পরিসীমা নাই। ঐটুকু জোটাতে গিয়ে কত যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খুঁকা, তার লেখা-জোখাই নাই। কত পন্থা যে তাকে তালাশ করতে হয়, তার সীমা-সংখ্যা নাই। অনেক কিছুই সে করে। সব কথা বলাও যায় না মানুষকে। না, এখন মিথ্যা বলবে না খুঁকা। নিজের মনের কাছে সত্য কথাটি বলতে আবার ভয় কি? ঐ সামান্য প্রয়োজনটুকু পূরণ করতে না পেরে মাঝে মধ্যে সিঁদের মধ্যেও মাথা এগিয়ে দিতে হয়েছে তাকে। ভয়ে দুরু দুরু করেছে বুক। আল্লার নাম জপেছে সে মনে মনে। আয় আল্লাহ! বাড়িআলার ধারাল টাঙিখানা যেন ঘাড় বরাবর না পড়ে। ধড়টা মাথাটা থেকে দু'ভাগ করে না দেয়।

মাছিরন হঠাৎ আড়মোড়া ভাঙে। ঘুম ভাঙল নাকি মানুষটার? হাতখানি মাছিরন সরিয়ে নেয় না। মাছিরনকে তার ঐ ডানাকাটা পরীর মতনই মনে হয়। এখন তার শরীরের ময়লা শতছিন্ন কাপড়খানি চোখে পড়ে না খুঁকার। অন্ধকারে ময়লা-ছেঁড়া অস্তিত্ব হারিয়েছে। একটি উষ্ণ নারীদেহের অস্তিত্বই কেবল টের পাচ্ছে খুঁকা। এই নারীটিকে তার রাজরাণী কল্পনা করতে দোষ কি? অন্ধকারেই সে দেখুক না তার পাশে যে নারীটি শুয়ে আছে, এখন সে ঐ কহকুভুল পাখির পেট থেকে বেরিয়ে আসা 'উপসী আজকন্যে'। তার 'মুতুন'ই 'রঙ্গ পিরতঙ্গ' হাত-পা-মাথা-গা সব। সবকিছুই।

হঠাৎ তারা দুজনেই তাদের নিজেদের অবস্থা বুঝে ফেলে। ঘুম নেই দু'জনেরই চোখে। আর যদি বা সামান্য নিঁদ আসে চোখে, তাহলে সেই নিঁদ হাজারো রঙিন স্বপ্নে ভরা।

টের পেয়েই মাছিরন বলে ওঠে, কী, ঘুম আসতিছে না?

হাই তুলে খুঁকা। সরাসরি সে জবাব দিতে পারে না। বরং উল্টা সে প্রশ্ন করে মাছিরনকে, তোর?

www.pathagar.com

মাছিরন খুঁকার প্রশ্নের জবাব দেওয়াকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে বলে, বোড় বিহিনে তুমি বাঁদালে যাবানি নাকি?

—যাতি তো হয়।

—গেলি চারডা মাছ থুয়ে যাইয়ো। বাছারা মাছ খাওয়ার খুব হাউশ্ করে।

আজ খুঁকার অসচ্ছলতার ভয় কেটে গেছে। তাই মনের সংকীর্ণতাও নাই। বলে, যাবানে। তারপর প্রশ্ন করে, তুই হাজি বাড়ি যাবি তো?

—হ্, যাবানে। গুলাপী আর সুরিরেও নিবানে সাঁতে।

—সুরিরে নিয়ে কী লাভ? চ্যাঙড়া মেয়িরে কি কাপুড় দিবি?

—চিষ্টা করতি দোষ কি?

একমত হয়ে যায় খুঁকা। চেষ্টা করে তো দেখতেই হবে। চেষ্টা ছাড়া কোন কাম হয়? খুঁকাও তো যাচ্ছে চেষ্টা করতে। যদি তার কপাল খোলে। যদি লিষ্টি মোতাবেক তার নামে কিছু খাস জমি বরাদ্দ হয়ে যায়, তাহলে তাকে আর পায় কে? জমি বরাদ্দের সম্ভাবনা ষোল আনার মধ্যে পনের আনা। চেয়ারম্যান সাব কথা দিয়েছেন, ভোটে প্রেসিডেন্টের পক্ষে কাজ করলে খুঁকা জমি পাবেই। আর 'বিরোদ্ধে' গেলে কপালে তার জুটবে 'আইঠ্যা কলা'। খুঁকা কাঁচা লোক নয়। সে 'বিরোদ্ধে' যাওয়ার মতন বোকামীটা কিছুতেই করতে পারে না। করেওনি। ভোটাভুটির আগে সপ্তাহ দু'তিন সব কাজ কাম ফেলে মুখে টিনের চোঙ লাগিয়ে মিছিলে মিছিলে সে শ্লোগান দিয়ে বেড়িয়েছে। 'বলদ মার্কা'য় দিলে ভোট, ছান্তি পাবে দ্যাশের লোক।' সেই শান্তির প্রথম ধাপে খুঁকা পা রাখবে আগামীকাল। বেজায় খুশি লাগছে মনে মনে। সেই খুশিই তো বার বার ভেঙে দিচ্ছে তার মনের কৃপণতা। খুঁকা বলে, ভাল মাছই চারডা থুয়ে যাবানে। ত্যাল মসল্লা দিয়ে এঁন্দে দিস বাছাদের।

মাছিরনের হঠাৎ মনে পড়ে যায় ঘরে 'ত্যাল-মসল্লা' সবই বাড়ন্ত। এ অবস্থাটি নতুন নয়। ব্যাপারটি নিত্যদিনের। তরকারীর মধ্যে খেসাড়ির ডাল একটু পেলেই যারা অমৃত লাভ করে, তাদের তেল-মসল্লার প্রয়োজনই বা কি? লবণ আর মরিচ ছাড়া অন্য মসল্লার দরকারই যে পড়ে না তাদের।

মাছিরন মুখ ফসকে বলে বসে, ত্যাল-মসল্লা তো নাই।

—আহ্। খুঁকা বিরক্তি প্রকাশ করে। তোরে নাই কতি মানা করিনি? হা রে, বুলিনি যে, নাই কতা কতি নাই? কলি সত্যি সত্যি নাই হয়ে যায়। তোর বুয়াঁস হলো, বুড়ি হলি, আক্কেল হলো না, বুইছিস?

www.pathagar.com

শেষের কথাটি শুনে মাছিরন অন্ধকারেই বেমক্কা হাসে। বলে, বুড়ি আমি হইনি গো আমার জুয়ান মরদ মানুষ। আমারে চারডি খাওয়াতি পরাতি পাল্লি দেখ্‌তাক্ আমি আজার বৌ আনিরে টেক্কা দিয়ে হার মানায়ে দিতি পারতাম।

মাছিরনের কথা শুনে খুঁকা একেবারে চুপ মেরে যায়। কথাটি সে সত্যি সত্যি বলছে কিনা কে জানে!

ভোর বেলা বিছানা ছেড়ে উঠেই সিদ্ধান্ত বদলে যায় খুঁকার। বাঁদালে মাছ আনতে গেলে 'পেরসিডেনে'র সাথে মুলাকাতের কম্ম সারা। এমনি একটা সুযোগ খুঁকার জীবনে আর কোন দিন আসার কথা নয়। রাতের 'ঝুঁঝকি' থাকতেই তাই সে মাছিরনকে জাগিয়েছে ঘুম থেকে। জাগিয়েছে গুলাপী এবং সুরিয়াকেও। মেয়ে দু'টির ঘুম কি ভাঙতে চায়? চোখে হড় হড় করে পানি ঢেলে দিয়েও যখন দেখে যে ঘুম ভাঙছে না, তখন লাগিয়েছে দুইজনকে গোটা দুই কুঁৎকা। আর অমনি বাপ্ বাপ্ করে উঠে বসেছে দুই হারামজাদী। কাপড় নিয়ে মানষে বাড়ি চলে গেলে, তখন কী কচু পাওয়া যাবে? বাসি আখার ছাই মিলবে তখন কপালে!

মাছিরনকে তৈরী হতে দেখেই হাফ হাতা ফতুয়াটা গায়ে পরে বেরিয়ে পড়েছে খুঁকা নূরপুরের উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে তার 'দুফোর' হয়ে গেল। খুঁকা অবাক হয়ে দেখে, সারা মাঠে মানুষের ভিড়ে তিল ধরেণের ঠাঁই নাই। ফুটবল মাঠের উত্তর পাশে গোলপোষ্ট বরাবর ঢাউস একটি মঞ্চ তৈরী হয়েছে। রঙ-বেরঙের সামিয়ানা টাঙিয়ে সাজানো হয়েছে সেই মঞ্চ। 'পেরসিডেন' যে পথে আসবেন, সেই পথের অসংখ্য মোড়ে মোড়ে তৈরী হয়েছে সুদৃশ্য তোরণ। সেই সব তোরণের গায়ে বিস্তর সাদা ফকফকা বকের পাখার মতন কাপড় জড়ানো। খান কয়েক খুলে নিতে পারলে বছর-দু'বছর আর জামা-কাপড়ের ভাবনা থাকত না খুঁকার। কিন্তু তা পারা যাবে না। দিনের বেলা ঐ কাজটি সম্ভবপর হবে না। 'আত্তিরবেলা' একটি সুযোগ করা যায় না? ভাবতে গিয়ে মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত পাল্টায় খুঁকা। ভাগ্য তো খুলে যাচ্ছেই খুব শিগ্‌গির। এখন আবার চুরি-চামারী করতে যাওয়া কেন? দু'দিন বাদেই অঢেল সম্পদে ভরপুর হয়ে যাবে খুঁকার সংসার। গুটিকয়দিন সবুর করুক না সে!

খুঁকার দিবাস্বপ্নটি হঠাৎ মানুষের উল্লাসে টুটে গেল। চারদিকের জিন্দাবাদ ধ্বনিতে সেও এক সময় যোগ দিল। মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, 'আমাদের নেতার চরিত্র' খুঁকা ভ্যাকা-চ্যাকা খেয়ে তাল হারিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুহূর্তকাল। নতুন শ্লোগানটি সে আগে শোনেনি বলে রপ্ত করতে পারেনি। মাইকেই ধূয়াটা শিখিয়ে দেয়া হল। বলল, ফুলের মতন পবিত্র। খুঁকা বার বার চিৎকার করে গলা ফাটাতে লাগল, ফুলের মতন পবিত্র...ফুলের মতন পবিত্র...।

www.pathagar.com

শ্লোগান থামলে মহামান্য প্রেসিডেন্ট সাহেব উঠলেন মঞ্চে। তার সারাটা শরীর ঢেকে গেল রাশি রাশি ফুলের মালায়। খুঁকা তাকিয়ে দেখল, শুধু মুখ-মাথা ছাড়া মহামান্য প্রেসিডেন্টের এখন আর কিছুই নজরে পড়ছে না।

বক্তৃতা শুরু হলে খুঁকা অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বর্তমান সরকারের আমলে কী কী উন্নয়ন কাজ হয়েছে, সে সব তারই ফিরিস্তি। খুঁকা নিজের স্বার্থের ব্যাপারটিতে এতই মগ্ন ছিল যে, সে সব শোনবার মত মানসিক ধৈর্য্যও তার ছিল না।

মহামান্য প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা শেষে আসন গ্রহণ করলেন। আর সেই মুহূর্তে স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেব উঠলেন মঞ্চে। হাতে লম্বা একখানি লিষ্টি। ভূমিহীনদের তালিকা। উঠেই তিনি ঘোষণা করলেন, হাসান উদ্দীন মিয়া পিতা মৃত ছবিরুদ্দিন মিয়া, গ্রাম-দক্ষিণ মকসুদপুর। জমির পরিমাণ সাত বিঘা। কছিমুদ্দীন তরফদার, পিতা মৃত রিয়াজুদ্দিন তরফদার, গ্রাম-আটখোলা। জমির পরিমাণ...।

এক এক করে অনেকগুলি নাম পার হয়ে গেল। প্রতিবারই খুঁকার নিজের নামটি শোনা যাবে আশায় তার বুকের মধ্যে ঠির ঠির করতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দেখল, তার নিজের নামটির কোন খোঁজ নাই। সে অস্থির হয়ে উঠল। একবার সে ভাবল, দৌড়ে গিয়ে মঞ্চে উঠে জিজ্ঞেস করে দেখবে, তার নামটি বাদ পড়ল কীভাবে? শেষমেশ সেই প্রবল আগ্রহটা সামলে নিয়ে সে শুকনো মুখে দাঁড়িয়েই রইল। হঠাৎ তার পাশ দিয়ে হাসানউদ্দীনকে যেতে দেখে ছুটে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, ভাইজান আপনেও তো জমি পালেন।

—হ, পালাম তো কী হইছে? হাসানউদ্দীনের চোখ-মুখে বিরক্তি।

—আমার নামডা যে শোনলাম না, মিয়াভাই!

— শোন নাই?

—না। খুঁকা শুকনো মুখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

—আরে। তুমি তো মিয়া ভূমিহীন কৃষক না, তুমি জমি পাবা ক্যানে?

—স্যাখুন যে কলেন, আমি পাব?

—হ, হ, তুমি পাবা। কিন্তক জমি না। তুমি তো মিয়া মাছমারা। তুমি পাবা জালির দাম। ইবার পেরসিডেন আলি তুমাদের জালির দাম দিবি।

খুঁকার ঠোঁটের ওপর প্রশ্ন এসে গিয়েছিল, আপনের তো ম্যালা জমি, আপনে

www.pathagar.com

কেমনে ভূমিহীন কৃষক হলেন মিয়া ভাই? কিন্তু সাহস হল না খুঁকার। জমি থাকলেও ভূমিহীন কৃষক হয় কিনা সেই বিষয়ে খুঁকার ভাল রকম জ্ঞান নাই। সুতরাং প্রশ্ন করে কোন্ ফ্যাসাদ হয় কে জানে!

হাসানউদ্দীন চলে যাচ্ছে দেখে হঠাৎ খুঁকার মুখে আবার একটা প্রশ্ন এসে গেল, কত ট্যাকা দিবি জালির দাম?

—জালির দাম? সে অনেক ট্যাকা। হাসানউদ্দীন হন হন করে হেঁটে চলে যায়, অত টাকার হিসাব-নিকাশের সময় এখন তার হাতে নাই।

ঘরে ফেরার সময় খুঁকার পা-দু'টি ভারি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু জালের টাকার আশ্বাসটি মনে পড়তেই সে ভার সে জোর করে দূর করে ফেলল। জমি সে পায়নি, না পাক। জাল একখানি জোগাড় করতে পারলে সেটাই বা মন্দ কি? তখন বাঁধালে গিয়ে আর ধর্না দিতে হবে না। নিজেই সে খালুই ভর্তি করে মাছ মারতে পারবে। আর সেই মাছ বিক্রি করলে আর কোন অভাব থাকবে না সংসারে।

ফেরার পথে আর বাস পায়নি খুঁকা। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে কখন যে সে ব্যাঙগাড়ির চৌমুহনীতে এসে পৌঁছে গেছে, টেরও পায়নি। চৌরাস্তার মোড়ে তার সাথে আত্তর বেওয়ার দেখা। একখানি কোরা কাপড় বগলে করে মেয়ে লোকটি হাজী বাড়ি থেকে ফিরছে। খুঁকাকে প্রথম প্রথম সে দেখতে পায়নি। বুড়ি ভাল করে দেখতেও পায় না চোখে। কিন্তু খুঁকার কণ্ঠস্বরটি কানে যেতেই সে হাঁউ মাঁউ করে চেঁচিয়ে উঠল, ও ভাই, কতি যাতিছ ভাই?

খুঁকা ভ্যাকাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

—খবর শুনো নি?

কী খবর শুনবে খুঁকা? বলে, কিছু শুনিনি তো বুবু।

আত্তর একটু থামে। তারপর চোখ দু'টি মোছে। বলে, তুমার সুরিডা...আর সে বলতে পারে না।

—কী হইছে সুরিডার?

— জাকাতির কাপুড় আনতি গিছিল হাজী বাড়িত্। মানষের পায়ের তলে চাপা প'ড়ি মারা গিছে। আত্তর এবার হা-হা করে ডুকরে ওঠে।

খুঁকার চোখের সামনে হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসে। মুহূর্তে সে পাষাণে পরিণত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

ভাব-সাব দেখে আত্তর খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বলে, মাছিরন লাশ নিয়ে বসে রয়িছে। তুমি হাজী বাড়িত্ যাও। কাফন-দাফন তো কত্তি হবি।

খুঁকা আর কোন কথা বলে না। সে যাত্রার দিকটি মাত্র পরিবর্তন করে। যে জিনিসটি আনবার জন্য এখন সে যাত্রা করছে, আর কিছু না পাক, সেটি পেতে তার মোটেই অসুবিধা হবে না।

www.pathagar.com

রূপাগলির সেই রূপসীর কথা আমি ভুলতেই পারি না কখনো। তার কথা মনে পড়লে, মনে আমার দারুণ একটা...। না, থাকগে সেকথা।

কী অদ্ভুত আর অবাক করা সব ভাবভঙ্গি তার। টান টান শরীর। শরীর পেঁচিয়ে লতানো শাড়ীর আঁচল, যেন মসৃণ ইউক্যালিপ্টাস গাছে মানিপ্লান্টের লতা উঠেছে জড়িয়ে জড়িয়ে। মাথায় রাশ খানিক চুল। বিলিতি কুকুরের ল্যাজের মতন সব ছাঁটা। পটল চেরা দুটি বড় বড় চোখে যেন দুটি নীলাভ পাথর বসানো মনি। সেই চোখে একবার বিস্ময়কর বৃষ্টির স্নিগ্ধতা আবার 'কুটিল সাপের হিংস্রতা'! কে যেন কবে নারী চরিত্রের নিগুঢ় তত্ব খুঁজতে গিয়ে বলেছিলেন, দেবা ন জানন্তি কূতা মনূষ্যা।

একবার সেই রূপাগলির সুন্দরী অষ্টাদশী ডেকেছিল আমাকে। বলেছিল, চলো, আমরা পিকনিকে যাই।

আমার মতন সেই অপোগন্ড কিশোরটির সেই আমন্ত্রণে সেদিন কী যে আনন্দ! ফাল্গুনের সেই শুকনো পাতাঝরা-অরণ্যে উধাও হয়ে হারিয়ে যাবার আনন্দ, লেকের কাক চক্ষু পানিতে দল বেঁধে সাঁতার কাটা কিংবা নৌকা চড়ে বাইচ খেলা, বুনো কাঠ মল্লিকার মিষ্টি গন্ধে আবিষ্ট হয়ে বসে থাকা, আর মাথার ওপর ঝিমধরা-বনানী শীর্ষে অলস ঘুঘুর একটানা সঙ্গীত শোনা, আমার বন-বিহারী, ছন্নছাড়া ক্ষুদে মনটাকে করে তোলে উতলা। আমি ওর কাছে জানতে চাই, কোথায় যাবে বনভোজনে?

— আমাদের বাগান-বাড়িতে। মেয়েটি জবাব দেয়।

হ্যাঁ, আমি সেই বাগান-বাড়ি চিনি। মুরারীপুর থেকে একটি সরু ধুলোট পথ গিয়েছে ডানদিকে বেঁকে। মাইল দুই গেলেই সেই বাগানবাড়ি-'চন্দ্রলেখা অরণ্য কুঞ্জ'। আমি একবার গিয়েছিলাম সেখানে হরিয়াল শিকারে। বড় লোকের বাগান-বাড়ি মানেই হচ্ছে শহর থেকে দূরে নিবিড় পল্লীর ছায়াময় গ্রামগুলি ছাড়িয়ে নির্জন বনাঞ্চলে এক অখন্ড শান্তির নীড়। কোলাহলময় শহরের অবিরাম ঝক্কি ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবার সে এক ছায়া-ঢাকা, পাখি-ডাকা অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের লীলাভূমি। সত্যিই তাই। সুন্দর ছিমছাম একটি বাড়ি। ফল-ফুল আর জানা অজানা লতা গুল্মের সমারোহ চারদিকে নিখাদ আনন্দের মত আছে ছড়িয়ে। বাড়িটি ঠিক বৌদ্ধ মন্দিরের চৌকো মঠের মতন একটি বাংলো। পাখ-পাখালির কুজনে কুহূরিত সে এক অপূর্ব স্বপ্নপুরী। সামনেই স্ফটিক স্বচ্ছ পানির মস্ত বড় আলিশান দীঘি। শরতের সেই সোনাগলা দিনে রক্ত শাপলার আরক্ত মুখগুলিকে চেয়ে থাকতে দেখেছি ঠিক সূর্যমুখী হয়ে। দীঘির একদিকে মস্তবড় ঘাটলা। তার প্রতিটি পৈঠা ধবল শুভ্র পাথর দিয়ে তৈরী। এমন সুন্দর প্রকৃতির অনুপম আশ্রয়ে বনভোজনের মুহূর্তগুলো কাটানো কী যে আনন্দের! সেই

www.pathagar.com

মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপটের কথা মনের পরতে ভেসে উঠতেই আমি ভীষণ খুশী হয়ে উঠি। কিন্তু আমার অবাকও লাগে খুব। এই রূপাগলির সুন্দরী মেয়েটি আমাকে কেন সেই আনন্দ তীর্থে আহ্বান জানায়?

সন্দেহ নিয়েই আমি জানতে চাই, আর কে কে যাবে পিকনিকে?

এক মুহূর্ত সে চুপ করে থাকে। মনে হয় কিছুটা যেন বিচলিত হয়েও ওঠে। কিন্তু সেটা সামলাতেও তার দেরি হয় না মোটে। বলে, এখনো লিষ্টি বানাইনি। সবার আগে তোমাকেই জিজ্ঞেস করে দেখছি। তুমি এগ্রী করলে অন্যদেরও তালিকা তৈরী করব।

আরিব্বাস! কী সাংঘাতিক সম্মান দান! আমার মতন পুঁচকে ছোঁড়াকে যে-মানুষ কড়ে আঙ্গুলের দাম দেয় না, তার এই প্রথম পরামর্শের যোগ্য ব্যক্তি আমি অর্থাৎ বীর পুঙ্গব মাস্টার নেপু। ভাবতেই গর্বে আমার বুকটা ফুলে ওঠে।

কেমন যেন দ্বিধার মধ্যেই পড়ে যাই। ওদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের বাড়ির সম্পর্কটা ভাল নয়। ওর বাপ-মা আর ভাইয়াটা কেমন যেন ভুতুড়ে স্বভাবের লোক। এই রূপাগলিতে ওরা যখন আসে, তখনকার কথা আমার বেশ মনে পড়ে। ঐ পচা পুকুরটাকে সামনে রেখে কাঠাখানিক নাকি কাঠা দেড়েক জমি কেনে ওর বাপ। সেই জমিতে তৈরী করে ছোটখাটো একখানা ছাপড়া ঘর। সে ঘরের বেড়াটিও ছিল চাটগাঁয়ে মূলা বাঁশের তৈরী। তারও আগের থেকেই আমাদের এই একতলা বাড়িটা একটেরে গলির মুখে দাঁড়িয়ে। তারপর দেশটা স্বাধীন হয়ে গেল, আর কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল, আন্দাজই করা গেল না। শেষতক হাজা মজা পচা পুকুরটা ভরাট হয়ে গেল। তারপর টনের পর টন রডের নামে আস্ত লোহাতেই ভর্তি হয়ে গেল সেই পুকুরের তলদেশ। সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার-স্যাপার। ঘটে গেল বলতে গেলে বছর দু-আড়াই এর ভেতরেই। ছেঁড়া চটি পায়ে গলিতে যে-মেয়েটিকে হেঁটে যেতে দেখতাম ইস্কুলে, কিছুদিনের মধ্যেই সে শুরু করল রিকসা করে যাওয়া। তার ক'দিন বাদেই চকচকে ক্রিমসন রেড ডাইহাটসু মিনিকারে এবং তারপরেই একেবারে ঢাউস আলিশান মার্সিডিস। পাড়ার লোকজন সব ভাবতে গিয়ে হাঁ হয়ে যায়। গলি থেকে বেরোবার পথে মার্সিডিসটা ধাক্কা খাওয়ার মতন হয়ে যায় দেখে আমার আব্বা ইচ্ছে করেই আমাদের পাঁচিলের খানিকটা ভেঙ্গে রাস্তাটা একটু বড় করে দিয়েছেন। কিন্তু তাও কেন যেন জানি না ওদের রেশারেশি ভাবটা কিছুতেই কমে না। মনে হয় কী এক গোপন ব্যাপার আছে, যেটা আমাদের কাছ থেকে সন্তর্পণে ওরা লুকিয়ে রাখতে চায়। পরে অবশ্যি সেটা যে কিছু জানাজানি হয়নি তা নয়। কিন্তু সেই 'ম্যানহেরু' মিয়ার প্রসঙ্গটা এখনকার আলোচ্য নয়।

কেন জানি না আমাদের ওপর সেই মেয়েটিরও রাগ কম ছিল না। আর এসব দেখে আমার আম্মাও বারণ করে দিয়েছিলেন ওদের সাথে মিশতে। কিন্তু একই পাড়ার মানুষ

www.pathagar.com

বলে মাঝে-মধ্যে তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েও যায়। আমিও পাশ কাটিয়ে যাই, সে-ও যায়। মেয়েদের দিকে তাকাতে আমার কেমন লজ্জা-লজ্জা লাগে। খানিকটা পাপবোধও তখন সৃষ্টি হয়েছে মনের মধ্যে। তার ওপর সুরুচির সীমা-সরহদ-ছাড়া মেয়ে মানুষ হলে তো কথাই নেই। পোশাক আশাক আর প্রসাধনীর রঙ চঙ দেখলে আমার মেজাজ যায় বিগড়ে। সেই কিশোর-বয়সেও সম্ভবত পরিবেশগত কারণেই বস্তুটির প্রতি আমার ঘৃণাবোধ ছিল সীমাহীন। সুতরাং আমার অবস্থাটি সহজেই অনুমেয়।

বেশ কিছুদিন আগে একদিন এইরকমই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছি, মেয়েটি আমাকে অবাক করে দিয়ে ডাকল, এই খোকা শোন্!

আমি থমকে দাঁড়াই, কী বলছ বল।

—আমাকে একটা ব্লেড কিনে দিবি?

প্রশ্ন করলাম, কী হবে ব্লেড দিয়ে? আমার ভয় হয় ব্লেড দিয়ে কী না কী আবার করে বসে।

—পেন্সিল কাটব, দে না এনে।

আমি বাধ্য হয়েই ওর কাজটা করে দিতে রাজী হয়ে যাই। হাজার হোক বয়সে তো কিছু বড়ই হবে।

বলি, কই পয়সা দাও। তারপর ফস করে রাস্তার ধারের মনোহারীর দোকান থেকে এনে দিই একটা ব্লেড।

ভাঙতিটা হাতে নিয়ে সে বলে, কত নিল রে?

—চল্লিশ পয়সা।

মেয়েটি আকাশ থেকে পড়ে। বলিস কী? চ-ল্লি-শ প-য়-সা? ব্লেডের দাম চল্লিশ পয়সা হয়েছে?

আমি কী জবাব দেব? অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি।

সে বলে, এই কদিন আগেও তো পঁচিশ পয়সা করে ছিল। এরই মধ্যে... চোখ দুটি তার আঁতি পাঁতি করতে থাকে। আমার হাত-টাতের উপর নজর চালায়। পারলে হয়তো পকেট-টকেটও একবার সার্চ করে দেখত। বোধকরি অতদূর সাহস হয়নি। বলে, যা, বাড়ি যা...

আমার দারুণ ঘেন্না হয়। কিন্তু মনের ক্রোধটা মনেই চেপে রাখাটি আমার আজন্ম অভ্যাস। আমি তাই চুপ করে যাই।

www.pathagar.com

মাঝে কটি বছর মাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এরই মধ্যে এত পরিবর্তন? মেয়েটি আমাকে পিকনিকে যাবারও দাওয়াত দিচ্ছে? তাও আবার তুই তোকারি ছেড়ে তুমি তুমি করে। অবাক না হয়ে পারা যায়?

জিজ্ঞেস করলাম, কখন যাবে?

সে বলল, কাল সকাল আটটার দিকে আমরা বেরিয়ে পড়ব ভাবছি! তুমি কয়েক মিনিট আগেই চলে আসবে। গাড়ি করে আমরা চলে যাব মুরারীপুর। সেখানে চা পর্ব সেরে তারপর চন্দ্রলেখা....

—চাঁদা লাগবে কত? আমি জিজ্ঞেস করি।

—তোমার চাঁদা লাগবে না, আমি পে করে দেব। তুমি আমার মেহমান থাকছ।

রাত্তির বেলা অনেককিছু ভাবলাম আকাশ পাতাল। ওদের চালচলন আর আচার-ব্যবহার আসলেই আমাদের কাছে কেমন কেমন ঠেকে। তাছাড়া আমার আম্মারও কড়া নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু এতদসত্বেও বন-বিহারী মনটি আমার পিকনিকের নাম শুনে একেবারেই বিহ্বল হয়ে পড়ল। এই যে কে বলেছিল না? একে তো নাচুনি বুড়ী তার ওপর ঢাকের বাড়ি। আমার ঠিক সেই দশা।

পরদিন সকাল আটটা কি আর বাজতে চায়? মিনিট পনেরো আগেই গিয়ে হাজির হলাম ওদের বাড়ি। দেখি চারদিক শুনশান। বাড়িতে মানুষ জন থাকলে যেমন একটা গমগম করা ভাব থাকে, তার কিছুই নেই। বাড়িঘরে তালা ঝুলছে। সামনে গুটিকয়েক হোয়াইট লেগ হর্ন খুঁটে খুঁটে কী যেন খাচ্ছে। মনে হল বাড়িতে কেউ নেই।

ফিরেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কী মনে করে দরজায় নক করলাম। বাড়ির ঝি মেয়েটি খুলে দিল দরজা। বিশ-বাইশ বছরের এই মেয়েটিকে প্রথম দৃষ্টিতে ঝি ভাবা শক্ত। পরনে তার চোখ ধাঁধাঁনো জেল্লাদার শাড়ী-ব্লাউজ। শরীরে বোধকরি ইমিটেশনের গয়না-গাঁটি। আইবুড়ো এই মেয়েটিকে খুব হাসিখুশী হয়েই থাকতে দেখি এই বাড়িতে।

আমাকে দেখেই সে বলল, কে, নেপু মিয়া নাকি? তুমি এখানে?

সে কথার জবাব না দিয়েই বললাম, বাড়ির আর সব মানুষ কই?

—বাগানবাড়ি গেছে।

মনটা আমার ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। সেই ধড়িবাজ মেয়েটির মিথ্যাচারে আমার সারাটা শরীর রি-রি করে জ্বলতে লাগল। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করা যায় ভাবতে থাকি।

www.pathagar.com

কিন্তু সে-ও এক-কি-দু মিনিটের জন্য, তার বেশী নয়, রূপাগলির সেই মেয়েটা সহসা টলতে টলতে আমার সামনে এসে হাজির হল।

ওকে আসতে দেখে ঝি মেয়েটি বলে, শ্যারী আপা, শুয়ে থাকবে তো উঠে এলে কেন?

ঝিয়ের কথায় মোটেই কান না দিয়ে সে বলল, বোসো।

আমি বসে পড়লাম সোফায়।

মেয়েটি এবার ঝিকে উদ্দেশ্য করে বলল, একটা কাজ করতে পারিস সণ্ণ?

—কী কাজ আপা?

—ন্যান্সির কাছ থেকে সেই ক্যাসেটটা আনতে পারিস? সেই যে, "আজ জ্যোস্না রাতে সবাই গেছে বনে" ...

—ওরে বাবা, এখন সেই মালতী পাড়ায় যেতে হবে? গিয়ে আসব কখন?

—এক্ষুণি আসবি। দু-সেকেন্ডের মধ্যেই। পারবি না? মেয়েটি কেমন কটমট করে তাকাল।

—পাগল! ঝি-মেয়েটি বোকার মতন হাসতে থাকে। রূপাগলির মেয়েটি এবার ধপাস করে বসে পড়ল আমার গা ঘেঁষে। পিঠে তার ভাঁজ করা শাড়ীর আঁচলটা আমার গায়ে এক ঝলক পরশ বুলিয়ে গেল। ঘাড়ের কাছে বব-করে ছাঁটা শ্যাম্পু করা চুল, বিলিতি কুকুরের ল্যাজের মতন ফুলে আছে। শরীর থেকে কেমন একটা গন্ধ উঠছে ভুরভুর করে।

রাগে চোখ পাকিয়ে সে ধাতিয়ে উঠল ঝি-টিকে। তোকে এক্ষুণি যে ফিরে আসতে হবে, সে-কথা কি বলেছি আমি? আসতে না পারলে ও-বেলায়ই না হয় আসিস। বাসায় তোর এমন কী দরকার পড়েছে?

ঝি-টি একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। কেমন একটা দুষ্টুমির হাসি তার চোখ-মুখে ঝিলিক দিয়ে গেল। আর তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

—যাচ্ছিস তো? তর সইছে না মেয়েটির।

ঝি এবার রাজী হয়ে গেল। বলল রান্না-বান্না রেডি আছে, দয়া করে খেয়ে নিও। আমার আসতে আসতে ও-বেলাই হয়ে যাবে। আমি ন-ভাবীর বাসাটা ঘুরেই আসব, যেতেই যখন হচ্ছে....

www.pathagar.com

—যা যা তাই করিস। বজ্জিমার জাহাজ বেটি!

ঝি-মেয়েটি চলে গেল হুকুম তালিম করতে আর আমি পড়লাম বেঘোরে। এই মুহূর্তে কিছুই যেন আমার মগজে ঢুকছে না। উসখুস করতে করতে বললাম, আমি এখন আর কী করব? আমিও যাই। পিকনিকে যখন যাওয়া হচ্ছে না....

মুখের কথা আমার শেষ হল না। সে বলল, বোসো। আমরা এখানেই আজ পিকনিক করব। বলেই সে আমার মুখের দিকে তাকাল। মেয়ে মানুষের এই অদ্ভুত দৃষ্টি আমি আর কখনো দেখিনি। শুকনো মুখে ফ্যালফ্যাল করে চাইতে লাগলাম।

মেয়েটি বলল, কী, ভয় করছে?

আমার সত্যি সত্যি ভয়ে বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব আওয়াজ উঠছে। কিন্তু মুখে সাহস জাহির করে বললাম, ভয় করব কেন? বলতে গিয়ে গলাটা আমার সামান্য কেঁপেও গেল।

সেটা আন্দাজ করে সে বলল, হুঁ, ভয়ই করছে, দেখি তোমার বুকটা। বলে ঝুঁকে পড়ে তার ডান হাতটি আমার বুকে ঠেসে ধরল। আমি লজ্জায় কাঠ হয়ে গেলাম।

মেয়েটি এবার উঠে দাঁড়াল। উঠে গিয়ে দরজার ক্যাচটা তুলে দিল। তারপর আমার একটি হাত ধরে সে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। একটা মাকড় যেমন একটা আরসুলাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি। সেখানে শাদা ধবধরে বিছানায় আমাকে বসিয়ে দিল জোর করে। বসতে গিয়ে ডুবে যাওয়ার ভয়ে আমি চমকেই উঠেছিলাম। এর আগে এমন নরম বিছানায় আমি আর কখনোই বসিনি।

আমাকে বসতে দিয়ে মেয়েটি কোথা থেকে হুট করে একটি টেবু মতন বোতল আনল বার করে। বোতলের লেবেলটার দিকে আমার চোখ পড়ে গেল। দেখলাম লেখা আছে ভি এ টি সিকস্‌টি নাইন।

বোতল থেকে এক গ্লাসের মতন তরল পদার্থ ঢেলে নিয়ে সে ঢকঢক করে গিলে ফেলল। তারপর আমার জন্যেও আধ গ্লাসের মতন ঢেলে আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও, খেয়ে নাও। এক মিনিটে নারভাসনেস কেটে যাবে। অ্যান্ড দেন ইউ উইল বি এব্‌ল টু এন্‌জয় পিকনিক।

মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। ফাল্গুণের মিষ্টি সকালে আমার শরীরে ঘাম ছুটেছে হু হু করে। আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছি।

আমার দশা দেখে নাকি জানি না মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল, বাড়ি শুদ্ধ লোককে আজ আমি ব্ল্যাক মেইল করেছি। মাথা ধরার নাম করে সন্নকেও ভাগালাম। এখন তুমি আর আমি। বলেই সে গুন গুন করে গেয়ে উঠল, তুমি আর আমি

www.pathagar.com

শুধু দুজনের পিকনিক হাসি আর গানে ভরে তুলব। আজ হৃদয়ের যত ব্যথা ভুলব। অ্যাই, তুমি ক্যামন লোক হে, ইউ ডোন্ট ফিল এনি ইন্টেস্ট। হুয়াটস্ দ্যাট?

আমি অসহায় চাহনি মেলে এক অকল্পনীয় নাটকের দৃশ্য দেখতে থাকি।

মেয়েটির গলায় এবার অসম্ভব জড়তা আসে নেমে। কেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় সে বলতে থাকে, হাউ নাইস্ ইওর রোজী নিপ্স। আই এ্যাম ম্যাড ফর দ্যাট। বলেই সে আরও খানিকটা তরল পদার্থ গলায় ঢেলে নিল।

আমার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমি বিহ্বল হয়ে ভাবছি। এখন কী করি, কোথায় যাই। কিন্তু তার আগেই মেয়েটি উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি ঠিক দুঃস্বপ্ন দেখার মতন এক মিনিট ওর দিকে তাকালাম। দেখলাম একটি সাক্ষাৎ পাপমূর্তি ধেয়ে আসছে টলতে টলতে। তারপর আমার পাশে ধপাস করে বসে পড়ে বলতে লাগল, আই লাভ ইউ, মাই প্রেম। ইউ লাভ মী অলসো। ডোন্চু? বলেই সে অক্টোপাশের মতন আমাকে জড়াতে চাইল।

মুহূর্তে আমার সম্বিৎ ও শক্তি দুইই যেন ফিরে এলো। আমি এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম। তারপর দিলাম এক দৌড়। সদর দরজার সিটকিনি খুলে দৌড় দিতে গিয়ে হাঁটুতে লাগল আঘাত। এই যে, এইখানেই সেই দাগটি আজো দিব্যি স্পষ্ট হয়ে আছে।

সেই আকস্মিক আর অদ্ভুত ঘটনাটি আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছিল ভীষণ। তারপর থেকে অনেকদিন পর্যন্ত ওদের ঐ বাড়ির পথ আমি আর মাড়াইনি। ওদের বাড়িতে কত উৎসব হল, কোনদিন গজল গানের অনুষ্ঠান, কোনদিন মিলাদ মাহফিল এবং সারারাত সবিনা খতম। আবার কোনদিন রবীন্দ্র সঙ্গীত ও গীতিনাট্যের আসর বসল। আমাদের বাড়িতে সেই সুবাদে দুই-একটা নিমন্ত্রণের কার্ডও দেখতাম উড়ে এসে পড়ত। কিন্তু বাড়ির কারুরই কেন যেন ঐ সব কার্ডের প্রতি কোনো আগ্রহ দেখা যেতো না। সেই ভুঁইফোড় বড়লোকীর বীভৎস দৃশ্য আমাকে ওদের সম্পর্কে দারুণভাবে নিরুৎসাহিত করে দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন কেন জানিনা হঠাৎ করে ওদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে আমার মনে খেয়াল চাপল। ঠিক কয়েকদিন আগে সেই রূপাগলির মেয়েটির বিয়ের উৎসব পার হয়ে গেছে। শুনলাম বরটি নাকি দেশরক্ষাবাহিনীর একজন অফিসার, — ক্যাপ্টেন। ভাবলাম ভদ্রলোককে দেখেই আসি না এক নজর। যেই কথা সেই কাজ। অনেকদিন পর ওদের বাড়ির গেট পেরিয়ে ঘরে ঢুকলাম! আমি ভাবতেই পারিনি যে, নব-দম্পতি তাদের ফুল বাগানের পথের ধারে খোলামেলা একটা জায়গায় বসে আলাপ-চারিতায় মগ্ন। আমাকে দেখেই হঠাৎ মেয়েটির মুখখানি রক্তশূন্য হয়ে উঠল।

বর জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ছেলেটি কে?

www.pathagar.com

মেয়েটি জবাব দিল, ঐ পাশের বাড়িতে থাকে।

—ওকে দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট আনানো যায় না?

মেয়েটি কোন জবাব দেবার আগেই তিনি আমাকে ডাকলেন, এই ছেলে শোনো।

আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

বললেন, আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাও তো। ফাইভ ফিফটি ফাইভ।

এই রকম চেনা নেই, জানা নেই লোকের আকস্মিক হুকুম আমাকে অবাক করে দেয়। তবু আমি রাজী হয়ে যাই। কিন্তু সিগারেট-ফিগারেট কেনার অভ্যাস নেই আমার তাই পথে গিয়ে সিগারেটের নামটিই ভুলে গেলাম। বাধ্য হয়ে আবার ফিরে আসতে হল। বললাম, কী নাম বললেন যেন সিগারেটের?

ভদ্রলোকের মুখটা বিরক্তিতে বিকৃত হয়ে উঠল, আরে হাবা নাকি ছোঁড়াটা?

মুহূর্তে রাগে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠল আমার মাথার রক্ত। হাতের টাকাটা ছুঁড়ে দিলাম ওদের টেবিলে। বললাম, আমার কাজ আছে। আমি পারব না এখন সিগারেট আনতে।

লোকটা কটমট করে তাকিয়ে বলল, ভারি তো ত্যাঁদোড় ছোকরা হে? তুই আমাকে চিনিস? আমি কী করতে পারি জানিস্‌?

আমার সারাটা শরীর রি রি করে উঠল রাগে। আমিও রাগের মাথায় বললাম, যা কচু পারেন করেন গে। আমি তার থোড়াই পরোয়া করি। বলে রাগের চোটেই আমি চলে যাচ্ছিলাম। মনে হল, আমার কথা শুনে ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন। বললেন, ছোকরা তো ভারি ডেয়ারিং!

আমার কানে ভেসে এল রূপাগলির সেই চরিত্রবতীর মন্তব্য। সে বলে উঠল, হবে না? ও যা একটা বদমায়েশ না? ওর দুশ্চরিত্রের কথা শুনলে তোমারও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে।

কথাটি বলল বটে, কিন্তু ভারি চাপা সেই কণ্ঠস্বর।

www.pathagar.com

বাবার ইন্তিকালের পর আখলাক মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এই বৃদ্ধ লোকটি রাজ্যের যত জঞ্জাল জড়ো করে, সভ্যতার রাজপথটি কন্টকিত করে রাখতেন। কান ঝালাপালা করে বলতেন, যে লোক পূণ্যের সূচনা করবে, তার দেখাদেখি যত লোক পুণ্য করবে, সবার অংশ সে লাভ করবে। ঠিক তেমনি, পাপের সূচনাকারীকে দেখে যত লোক পাপ করবে, সবার পাপের সে হিস্যা পাবে। এইসব বলে বলে ভয়ানক জ্বালাতন করতেন। আধুনিক যুগের দুর্বার জোয়ারকে কি তিনি বালির বাঁধ দিয়ে রুখতে পারলেন? পারলেন না। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে বুড়ি মাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আখলাক এবং রুখসানা সভ্যতার নবারুণে স্নিগ্ধ স্নাত হয়ে উঠল। পাপ-পুণ্যের দ্বিধাদন্দ্ব কাটিয়ে মুক্তির দুর্বার স্রোতে তারা গা ভাসিয়ে দিল।

বাবার ইন্তিকালের সপ্তাহ খানেক পরেই রুখসানা আফরোজকে আখলাক ভর্তি করে দিল মধুমতি নৃত্যাঙ্গনে, নাচ শেখার জন্যে। এস. এস. সি. পাশের পর রুখসানাকে কলেজে ভর্তি করাতেও বাবা আপত্তি তুলেছিলেন। সহশিক্ষা তিনি পছন্দ করতেন না। প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি বটে! তাঁর মৃত্যুর পর রুখসানার শিক্ষা-দীক্ষার সব পথ খুলে গেল। মরহুম বাবা অষ্টপ্রহর জড় সভ্যতার নিকুচি করে যে জিগির তুলতেন, সেই সভ্যতার অপর্যাপ্ত আলোকে রুখসানা আফরোজের দিল-দিমাগ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। খুশীর আবেগে আখলাক হোসেন আনন্দলোকের একটির পর একটি সিঁড়ি তরতর করে ডিঙ্গিয়ে যেতে লাগল। প্রতিক্রিয়াশীল বাবা ধনভাগ্যের দুয়ারে বিরাট একটা বাঁধ তৈরী করেছিলেন। বাবার মৃত্যুর সাথে সাথে আখলাক সেখানে কোদালের ঘা বসিয়ে দিল।

সেদিন সকাল বেলায় বোনের দিকে তাকিয়ে আখলাকের মনে হল, ওর মনোলোভা রূপ-মাধুরী দিয়ে চলচ্চিত্র জগতে সে এক প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারবে। রুখসানাকে কাছে ডেকে বলল, আজকে স্টুডিওতে গিয়ে ছয় কপি ছবি তুলবি।

থমকে দাঁড়িয়ে রুখসানা বলল, কেন, হঠাৎ ছবি কী করবে, ভাইয়া? নাকি আমার ভাবী বরের কাছে পাঠাবে?

—বর? না না বর ট'র তোর এখন দরকার নেই, রুকি! তোকে অনেক বড় কাজ করতে হবে। অনেক বড় কাজ! বর হলেই তো তখন ছেলেপুলে হয়ে যাচ্ছেতাই হয়ে যাবি। বড় কাজের পথে ওসব বাধা বুঝলি?

—বড় কাজ, তা আবার ছবি দিয়ে কেন?

—ছবি দিয়েই করতে হবে। আমি একটা ডিসিশন নিয়েছি, জানিস?

—কী ডিসিশন?

www.pathagar.com

—আমি ডিসিশন নিয়েছি, তোকে আমি সিনেমায় নামাব।

রুখসানা অভিভূত হয়ে বলল, সত্যি ভাইয়া!

আখলাক বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি।

সেদিনই বিকেলে লাস্যময়ী ষোড়শী-দেহের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি-অলা পোস্টকার্ড সাইজের ছয়খানা আলোকচিত্র এনে রুখসানা ভাইয়ের হাতে গুঁজে দিল। ছবি পেয়ে আখলাক 'উরিব্বাসরে, সুপার ফাইন, মাইরি ইত্যাদি' বলে বোনের পিঠ চাপড়ে উৎসাহিত করে সেদিনই ঢাকায় রওয়ানা দিল। আর তার মাত্র তিন দিনের মধ্যেই রুখসানাকেও পুরোপুরি তৈরী হয়ে ঢাকায় যেতে হল।

লেকের ধারে ছোট্ট একটি একতলা ছিমছাম বাড়ি। বাড়ির ধার ঘেঁষে পুবদিকে লেকের পানি চিকচিক করছে সকালের রোদে। সামনে রাস্তার ওপাশে গুটি কয়েক ইউক্যালিপ্টাস গাছ আকাশ ছোঁয়া মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। বাড়ির গেটের পাশে বোগোনভেলিয়া ফুটে আছে। বোনকে সাথে নিয়ে আখলাক হোসেন একটি ভাড়া করা কারে সেখানে উপস্থিত হল। গাড়ির হর্ন বাজতেই দারোয়ান গেট খুলে দিলে আখলাক জিজ্ঞেস করল, হুমায়ুন সাহেব বাসায় আছেন?

—সায়েব তো সকাল সকাল উঠেন না। বলেই রুখসানার প্রসাধন চর্চিত লাবণ্যময়ী মুখখানার দিকে নজর পড়তেই দারোয়ানের চোখে কাজের গুরুত্বটা বেড়ে গেল। বলল, আসেন স্যার। আমি সায়েবকে ডেকে দিচ্ছি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হুমায়ুন কাদির হাসি মুখে এসে করমর্দন করে দাঁড়াল। আখলাক বলল, এই আমার বোন, রুখসানা আফরোজ।

রুখসানা হাসি মুখে কপালে হাত ঠেকাল। মিষ্টি হাসির মধ্য দিয়ে উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হল।

হুমায়ুন কাদির ওকে দেখে খুবই আনন্দিত হয়ে উঠল। এ লাইনে এ-রকম জিনিস খুব সহজে বড় একটা মেলে না। ওদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আসুন-আসুন, ভেতরে আসুন।

বড় সড়ো একটা হল ঘর। হুমায়ুন কাদিরের ড্রয়িং রুম। মেঝেতে পুরু কার্পেটের গালিচা। বার্মিজ টিকের সুদৃশ্য টি.ভি. স্ট্যান্ডের ওপর মূল্যবান রঙিন টেলিভিশন। দেয়ালে ভারতীয় চিত্র তারকা হেমামালিনীর একটি আবক্ষ লাস্যময়ী ছবি। ছবিটির গায়ে ইজিপ্‌শিয়ান অর্কিডের আর্টিফিসিয়াল এক ছড়া মালা। নীচে শো কেসের ভেতর অসংখ্য পুতুল, ব্রোঞ্জের মূর্তি, আর রঙ বেরঙের সামুদ্রিক ঝিনুক। ঘরে আসবাবের

www.pathagar.com

দিকে চোখ পড়তেই প্রাচুর্যের ঝলকে রুখসানার চোখ ঝলসে গেল। সে অভিভূতের মতন চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

হুমায়ুন কাদির বলল, মিস রুখসানার ছবি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, এ লাইনে তাঁকে ভালই স্যুট করবে। তবু জানেন কি? আসল জিনিস হচ্ছে অভিনয় এবং কণ্ঠস্বর। এ দুটোতে সাক্সেস্ফুল হতে পারলে, আমি বলব তার জন্যে বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে।

আখলাক বলল, অভিনয় ত সে ভালই করে। টু বী ভেরী ফ্র্যাঙ্ক, ছোটবেলায় এসব ব্যাপারে সে বড় একটা চান্সই পায়নি কিনা। পেলে আরো এক্সপার্ট হয়ে উঠতে পারত।

—কেন, ছোটবেলায় চান্স পান নি কেন?

—আমার বাবা ছিলেন আউট-ডেটেড মানুষ। দারুণ গোঁড়া। অভিনয়-টভিনয় ছিল তার দু'চক্ষের বিষ। বেহেশ্ত আর দোজখ নিয়েই ছিল তার কারবার। এখন তারই কোন একটাতে অবশ্যি তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। বলেই আখলাক হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, আজ বছর খানেক থেকে রুখসানা অভিনয় করার সুযোগ পাচ্ছে।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে বাসার চাকরানী এসে বিভিন্ন উপাচারে সজ্জিত একটি ট্রে ভর্তি খাবার সামনে রেখে গেল।

হুয়ায়ুন বলল, নিন্ শুরু করুন, বেগম সাহেবা ঘরে নেই, থাকলে মিস রুখসানার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিতে পারতাম!

রুখসানা মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করল, তিনি কোথায় গেছেন?

হেসে উঠল হুমায়ুন। বলল, কোথায় যে গেছেন, এ মুহূর্তে আমার পক্ষে তা সঠিক বলা মুশকিল। গিয়েছেন লন্ডন, সেখান থেকে স্টেটস-এ যাবেন। সিংগাপুরেও এক বার যাওয়ার কথা। মাসের পনের বিশ দিন লন্ডন, সুইজারল্যান্ড, রোম, প্যারিসেই তো কাটে!

রুখসানা অভিভূত হয়ে শুনছিল। আখলাক খেতে খেতে প্রশ্ন করল, এত বেশি বাইরে থাকতে হয় কেন?

হুমায়ুন বলল, তিনিও বিজ্নেস করেন। ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে ফেয়ার সেক্স্দেরই তো বেটার অপরচুনিটি! রুখসানার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, ওয়ান ডে মিস্ রুখসানা মাস্ট শাইন। আ আম শিওর, শী উইল অ্যাকোয়ার দ্যা ওয়েল্থ অব আলাদিন। বলেই সে হো হো করে হেসে উঠল। রুখসানাও সে হাসিতে যোগ দিল।

হুমায়ুন হাস্যরতা রুখসানার দিকে ভালো করে দৃষ্টি দিল। মাতাল করা হাসি। হাসলে মেয়েটির গালে টোল পড়ে। কণ্ঠস্বরটি স্পষ্ট এবং সুমধুর। সব চাইতে অদ্ভুত

www.pathagar.com

সুন্দর ওর দুটি দাঁত। 'হাসিতে মুকুতা ঝরে' এ যেন তারই নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

মাথার ওপর শ্লো স্পীডে পাখা ঘুরছে। তারই অল্প অল্প বাতাসে রুখসানার শ্যাম্পু করা রেশমী চুল গালের দুপাশে ফুর ফুর করে উড়ছে। শরীরে পিচ্ছিল শাড়ীর আবরণটি বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সেটা সামলাতেই তার হিমসিম দশা। এই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে মেয়েটির চমৎকার একটা মুখভঙ্গিমা ফুটে উঠেছে। হুমায়ুনের চোখ দুটি জহুরীর চোখ। সে চোখ ঠিকই আন্দাজ করেছে, ছবির জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে হলে ঐ রকমই একখানি মুখের দরকার।

আখলাক রুখসানার সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে দিন তিনেকের মধ্যেই দেশে ফিরে গেল। হুমায়ুন বলল, মিস রুখসানা আপাতত তাঁর খালার বাসায় থাকুন। 'সোনার স্বপনে' কন্ট্রাক্ট হলেই তিনি সুবিধামত ভাড়া বাসায় উঠে যাবেন। তারপর নিজস্ব বাড়ি গাড়ি? সেটা শুধু সময়ের ব্যাপার।

আজ এফ. ডি. সি-তে সুটিং। তাই সকাল সকাল রুখসানা হাজির হল হুমায়ুনের বাড়িতে। একটা নির্জন জায়গায় একজন পর পুরুষের সামনে রুখসানার কেমন বাধো বাধো লাগছিল। সামনাসামনি বসে মাঝে মাঝে অস্বস্তিবোধ ওকে ছেঁকে ধরছিল। কথার ফাঁকে ফাঁকে হুমায়ুনের তীক্ষ্ণ চাহনির সামনে রুখসানা যেন ঘেমে উঠছিল। যে শক্তি নিয়ে সে ছায়াছবির জগতে নায়িকা হতে এসেছিল, হুমায়ুনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে সে শক্তি যেন মিইয়ে পড়ল। বিয়ে করতে গিয়েও মানুষ এমনভাবে মেয়ে মানুষকে দেখে না। রুখসানার যৌবন-পুষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কীভাবে দর্শকদের মনে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করবে, এ ছিল তারই গোণাপড়া।

এমনি বিব্রতকর অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যেই মেয়েটি কিছুক্ষণের জন্যে বাথ রুমে ঢুকেছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, চা প্রেস্টি, চপ আর দু'বোতল কোক সামনে নিয়ে হুমায়ুন বসে বসে তার এন্তেজার করছে। রুখসানাকে দেখতে পেয়ে সে বলল, নিন, ঝটপট নাশতা করে নিন। এক্ষুণি আমাদের বেরোতে হবে। নটার মধ্যে এফ. ডি. সি-তে না পৌঁছুলে সব গড়বড় হয়ে যাবে!

কাঁটা চামচ দিয়ে মাটন চপ মুখে তুলতে গেল রুখসানা, কিন্তু কী একটা অবোধ্য জড়তায় ওর হাতখানি আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কোনমতে মুখে পুরে দেয়া সেই খাদ্যটুকু ওর গলা দিয়ে নামতেই চাইল না।

হুমায়ুনের মুখভর্তি খাবার। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলল, কী হল মিস রুখসানা? খারাপ লাগছে নাকি?

রুখসানা বলল, যে করে তাড়া দিচ্ছেন, তাড়াতাড়ি গিলতে গিয়েই তো গলায় বেধে গেছে।

www.pathagar.com

হুমায়ুন বলল, এক ঢোক কোক খেয়ে নিন। গলায় বেধে শেষ পর্যন্ত মারা পড়বেন নাকি?

রুখসানা হাসল। সেই হাসির বিজলী আভায় হুমায়ুনের অন্তরটা ঝলমলিয়ে উঠল। রুখসানা হাসি মুখেই বলল, এত সহজেই মরব ভেবেছেন? আমার সামনে যে অনেক বড় কাজ!

অল্পদিনের মধ্যেই ছায়াছবির সোনালী পর্দায় মিস রুখসানা আফরোজ মনিকা নামের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। আর এই নতুন নামের সৌরভে দর্শকবৃন্দ আমোদিত হয়ে উঠল। তার সুডৌল তনুটির দিকে নির্নিমেষ চেয়ে চেয়ে লক্ষ লক্ষ আত্মভোলা জনতা ঘরে-বাইরে সর্বত্র তড়পাতে শুরু করল।

সারা দেশের হাজার হাজার প্রেক্ষাগৃহ মুখর হয়ে উঠল। যুবকদের মুখে মুখে মনিকা নামটি অষ্টপ্রহর ঘুরতে লাগল। তারই সুবাদে অতি অল্প সময়ের ভেতর রুখসানা আফরোজের ধনৈশ্বর্যের জোয়ার দেখা দিল। দারিদ্র্য কবলিত ভাইয়ের সংসারেও তার ঢেউ গিয়ে লাগল। আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদ তৈরী হল। মরহুম বাবার আঁকড়ে ধরে রাখা দারিদ্র্যকে ঝেটিয়ে বার করে আখলাক হোসেন প্রাচুর্যের বুকে দাঁড়িয়ে আর একবার মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

শহরের সব চেয়ে অভিজাত এলাকায় মায়া বিল্ডিং-এর দোতলায় সুন্দর বাসা নিয়েছে মনিকা। দর্শনেচ্ছু সাথী-সতীর্থদের পদধুলিতে বাসাটি প্রায় দিনই ধন্য হয়ে উঠে। এখন মনিকার পরিচিতির জগত আরো প্রসারিত হয়েছে। এবং সেইজন্যেই বোধহয় হুমায়ুনের সাথেও তার বড় একটা দেখাশোনা হয় না।

সেদিন দুপুরের দিকে হুমায়ুন কাদির মনিকার দরজার কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল।

ভেতর থেকে যে মানুষটি এসে দরজা খুলে দিল তাকে দেখেই হুমায়ুন চমকে উঠল। ছায়াছবির জগতে হাজারো স্ক্যান্ডালের হোতা ভিলেন অভিনেতা মাহবুব। 'সোনার স্বপন' ছবিটি করার সময় এই মাহবুবই রুখসানাকে নবাগতা আনাড়ি বলে অভিহিত করেছিল। তা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। পরে হুমায়ুনকে সে দারুণ বিপদে ফেলে পিঠটানও দিয়েছিল। সে সব কথা তো রুখসানার ভুলে যাবার নয়! তার জন্যে যে মোটা অংকের গচ্ছা দিয়েছিল হুমায়ুন, সে কথাও তো রুখসানা ভালো করেই জানে। অথচ কী আশ্চর্য সেই মানুষটিই এখন মনিকার নিভৃত অন্দরে!

হুমায়ুনকে দেখে মাহবুব কেমন শুষ্ক হাসি ঠোঁটে রেখে বলল, আরে কাদির ভাই, আপনি? অনেকদিন পর দেখা হল। কী মনে করে?

www.pathagar.com

হুমায়ুন সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, রুখসানার সাথে একটু দরকার ছিল। ও বাসায় আছে তো?

—আছে। ভেতরে চলুন।

হুমায়ুন ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকল। ছোট একটা টেবিলের ওপর একখানি দাবার ছক পড়ে আছে। তার ওপর ঘুটিগুলো যথারীতি সাজানো। সম্ভবত হুমায়ুনের কণ্ঠের আওয়াজ পেয়েই খেলুড়েরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

হুমায়ুন বলল, তোমরা দাবা খেলছিলে নাকি?

মাহবুব বলল, মনিকাই অনুরোধ করে বলল, মাহবুব ভাই এসো। তোমার সাথে একটু দাবা খেলি। তাই ...। আমার আবার দাবা খেলার সময় কোথায়?

—মনিকা দাবা খেলা জানে নাকি?

—তুখোড় খেলে মাইরি! আমি তো পেরেই উঠি না ওর সাথে। প্রায় দিনই হেরে যাই।

—ও, তুমি হেরেও যাও? একদিনও তুমি জিততে পারো না।

মাহবুব থতমত খেয়ে বলল, এক আধদিন জিতি বৈকি! বলেই জোর করে প্রসঙ্গটা পাল্টে দিতে চাইল। বলল, কাদির ভাই তো আমার ওপর দারুণ চটেই আছেন।

হুমায়ুন কাদির কেমন নির্লিপ্ত মুখে তাকাল মাহবুবের দিকে। বলল, মানুষ কি আর মানুষের ওপর চিরদিন চটে থাকতে পারে, মাহবুব!

—নইলে আজ তিন বছরে আপনি একটি বারও আমার খোঁজ খবর নিলেন না?

—সে অভিযোগটা তো আমিও করতে পারি।

মনিকা দুহাতে দু' কাপ চা এনে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, অভিযোগ করে আর লাভ নেই। বরং চা খাও। তাতে লাভ হবে।

হুমায়ুন গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আমি চা খেতে আসিনি। এসেছি অন্য একটা কাজে। তোমরা দেখছি খেলাধূলায় ব্যস্ত। এখন থাক্। অন্য এক সময় আসব।

মাহবুব তড়িঘড়ি করে বলে উঠল, আপনি কথা সারুন কাদির ভাই। বরং আমিই এখন যাই। বলেই সে উঠে দাঁড়াল।

হুমায়ুন বলল, আমি আবার তোমাদের বিরক্তির কারণ হলাম না তো, ভাই?

মাহবুব বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আরে, আপনি কী যে বলেন!

www.pathagar.com

মাহবুব চলে যেতেই হুমায়ুন রুখসানাকে প্রশ্ন করল, ও চা না খেয়েই চলে গেল, ওকে অনুরোধ করলে না?

মনিকা অনেকটা নির্লিপ্তভাবে বলল, না, ওকে আমি ডেকে আনিনি। যেতে চাইলে আটকে রাখারও আমার গরজ নেই।

—তাই?

—তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ?

—না, আশ্চর্য হবার কী আছে? কিন্তু যাক সে কথা। তোমার কাছে একটা জিনিস জানতে এসেছিলাম।

—কী জিনিস?

—তুমি কি গত পরশু লোটাস ক্লিনিকে গিয়েছিলে?

—কে বলল তোমাকে?

—যেই বলুক, গিয়েছিলে কিনা।

মনিকা একটু থেমে বলল, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

—তোমার কি কোন অসুখ বিসুখ করেছিল?

মনিকা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, হ্যাঁ, অসুখ হয়েছে কিন্তু আমি চিকিৎসা করাই নি। চলে এসেছি।

— কেন চিকিৎসা করাও নি কেন?

—সে কথা বলব পরে। মেয়েদের সব কথা চট্ করে শুনতে নেই, জানো তো?

হুমায়ুন বলল, অও। কিন্তু পুরুষদের কথা চট্ করে শুনতে তো দোষ নেই। আমার খবরটা তাহলে তোমাকে জানিয়ে দিই। তোমার মুনমুন ভাবী হলিউডে গিয়ে আবার একটা বিয়ে করে ফেলেছে।

—মানে? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মনিকা।

—মানে খুব স্পষ্ট। সেখানে আমার চাইতে ভাল লোক পেয়ে গেল, তাই।

—কেমন করে বুঝলে যে ভাল লোক সে পেয়ে গেল?

হুমায়ুন ফিকে হাসি হাসল। বলল, আমার বাড়ি ঢাকায় আর তার বাড়ি হলিউডে। আকাশ পাতাল ডিফারেন্স।

—হলিউডে বাড়ি হলেই ভাল লোক হবে তার গ্যারান্টি কি?

www.pathagar.com

—অন্য গ্যারান্টি মানুষ তো চায় না। মানুষ তো সম্পদের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মনিকা এক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল। তারপর বলল; অধঃপতন! বলে নিজের কথায় নিজেও একবার শিউরে উঠল।

হুমায়ুন সেদিকে লক্ষ্য না করেই বলল, তাই তো হয়। যার দৃষ্টি থাকে ঐশ্বর্যের শিখর দেশে, পায়ের তলার গর্ত দেখার তার সময় কোথায়?

মনিকা শুধাল, যাকে বিয়ে করল, সে কি ঐ দেশেরই লোক?

—চিঠিতে তো বাঙালী বলেই জানিয়েছে।

—ও, তাহলে তোমাকে চিঠিও দিয়েছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। চিঠি দেবে না মানে? সে যে খুব অবিডিয়েন্ট ওয়াইফই ছিল, জানো না? বলেই হুমায়ুন আর একবার ফিকে হাসি হেসে উঠল।

—তুমি জাহান্নামের বুকে বসেও পুষ্পের হাসি হাসতে পার, কাদির ভাই!

—হতে পারে! বলেই হুমায়ুন নির্লিপ্ত মুখে বসে রইল।

তারপরেই মনিকার আর খোঁজ রাখত না কাদির। সে নাকি দিল্লী না কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল এতদিন। একদিন অবাক হতে হল। মাস চারেক পর একদিন সকালে সে বাইরে বেরোবে, ঠিক সেই সময় অপরিচিত মহিলার টেলিফোন পেয়ে সে চমকে উঠল। রুখসানা দারুণ অসুস্থ, এই মুহূর্তে হুমায়ুনকে সে লোটাস ক্লিনিকে দেখা করতে বলেছে।

খবর পেয়েই হুমায়ুন ড্রাইভারকে ডেকে তাড়াতাড়ি গাড়ি রেডি করতে বলল।

লোটাস ক্লিনিকে পৌঁছে সামনেই একজন সিস্টারকে দেখতে পেয়ে হুমায়ুন জিজ্ঞেস করল, মিস রুখসানা নামের একজ পেশেন্ট কোথায় আছেন বলতে পারেন?

সিস্টার একটু চিন্তা করে বলল, রুখসানা নামের একজন পেশেন্ট অবশ্যি আছেন, কিন্তু তিনি তো মিস্ নন।

হুমায়ুন বলল, কোথায় আছেন তিনি?

সিস্টার বলল, পাঁচ নম্বর কেবিনে। ঐ ডান দিক দিয়ে গিয়ে বাম হাতে দেখবেন, দরজায় নম্বর লেখা আছে।

হুমায়ুন সেখানে গিয়ে দরজায় মৃদু আঘাত করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজাটা খুলে গেল। হুমায়ুন ঘরে ঢুকে যা দেখল, তাতে তার ভিরমি খাওয়ার পালা! রুখসানার বেড়ে

www.pathagar.com

একটি সদ্য-জাত শিশু নির্বিকারে ঘুমুচ্ছে।

হতবাক হুমায়ুন রুখসানাকে প্রশ্ন করল, এ ছেলে কার?

রুখসানা ধীরে ধীরে মুখ তুলে হুমায়ুনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার পেটে জন্মেছে।

হুমায়ুন রুক্ষ কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করল, ওর জন্মদাতা কে?

রুখসানা মুখ নামিয়ে নিয়ে জবাব দিল, জানিনে।

—জানো না মানে? হুমায়ুনের কণ্ঠস্বর ঝনঝন করে উঠল।

রুখসানা সপ্রতিভ গলায় বলল, কার নাম করব?

জবাব শুনে হতবাক হুমায়ুন রুখাসানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার দুটি চোখ যেন পাথর হয়ে গেছে। ওকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে, রুখসানা পুনরায় প্রশ্ন করল, যদি বলি ওর জন্মদাতা তুমি।

—আমি? এতবড় মিথ্যে কথা তুমি বলতে পারলে? আমি দু'বছরের মধ্যে কোনদিন তোমার দেহস্পর্শ করেছি, বলতে পারো?

—না, করনি। কিন্তু এ দরজা তো তুমিই একদিন খুলে দিয়েছিলে। সবার সাথে মেশার সুযোগও তুমিই...

হুমায়ুন বাধা দিয়ে বলল, সে দোষ যদি তুমি আমায় দাও, তবে আমি বলব, দোষ আমার নয়। তোমার ঐ দেহের বিনিময়ে ভাগ্য গড়ার জন্যে যে লোক তোমাকে এই হাটে বিক্রি করে গেছে, দোষ তোমার সেই সহোদরের। সেই তোমার ঐ অবৈধ ফসলের ন্যায্য মালিক। তোমার যৌবনের বিনিময়ে সে যে প্রাসাদ গড়ে তুলেছে, সেই প্রাসাদেই ওকে সে আশ্রয় দিতে বাধ্য।

রুখসানা বলল, তাই যদি হয়, তবে তাকেই তুমি একথাটি জানিয়ে দাও। পারবে?

—ঠিক আছে, তাই জানাবার জন্যেই আমি চললাম। বলেই হুমায়ুন কাদির হন হন করে বেরিয়ে গেল।

www.pathagar.com

শরাফত আলীর ব্যবসা

সংসারে পা রাখতে গিয়ে সাংঘাতিক হোঁচট খেল শরাফত আলী। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘেরা ঐ জায়গাটায় অগণিত চোরাগর্ত। তার একটা থেকে পা তুলতেই আর একটায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়। আবার দিশাহীন অকূল পাথার সুমুখে। কখনো বা গর্জনশীল ঝড়ো মেঘ মাথার ওপরে, নীচে সীমাহীন তপ্ত বালিয়াড়ি। ওরই মধ্যে থাকতে হচ্ছে এবং বাঁচতে হচ্ছে তাকে।

অকর্মন্য বাপ, অপোগন্ড ভাইবোন আর ভাবনা কাতর মা, এইগুলি এখন তার কাছে এক একটা সামুদ্রিক ঢেউ। এগুলির বুকের ভেতর আবার অসংখ্য হাঙর কুমীর। কান আর চোখ সতর্ক রাখতে হয় সর্বদা। নইলে খুবলে খাবে হাড্ডি মাংস। পায়ের তলায় শক্ত মাটির হদিস নেই। ড্যাবডেবে চোরাবালি। চুপচাপ দাঁড়ালে হয়ত দুদন্ড দাঁড়ানো যেতে পারে। কিন্তু নড়েছ কি মরেছ। যত নড়বে ওপরে ওঠবার জন্য, ততই তলিয়ে যাবে নীচের দিকে। সে শুধু গিলতেই জানে, উগরাতে জানে না। ওই চোরাবালির 'পরে, নিকষ কালো আঁধারে হাঙর-কুমীর সঙ্গে নিয়ে একবার দাঁড়াতে গেল শরাফত আলী। দেখল ভারি কঠিন ব্যাপারটা।

বাজার দরের ভেল্কিবাজী দেখে ভিরমী দেয় মাথায়। শম্বুক গতি বলে একটা শব্দ অভিধানে লেখা আছে। এত দিন ঐটা বাজার দর বৃদ্ধির ব্যাপারে ব্যবহার করা চলত। এখন অচল হয়ে গেছে। জিনিস পত্রের দাম হু হু করে তুঙ্গে উঠছে। মূল্য বৃদ্ধির লাল ঘোড়া আজকাল ভয়ানক ক্ষেপে গেছে। দাবড়িয়ে আস্‌ছে নিত্যদিন বাঘাবাঘা ধাপ ফেলে। আর বুঝি রক্ষা নেই।

শরাফত আলীর মাথার চুল উঠে যাচ্ছে থোকায় থোকায়। এই জায়গায় ঢোকার আগে ঘন চুলের বাহার ছিল মাথায়। টেরি কাটত হরেক রকম ফ্যাশান করে। তেল লাগাত সুন্দর ফুল-ফুল গন্ধঅলা। একবার চার-পাঁচটা চুল খসতে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছিল। সে আতংক আর নাই। আতংক উবে গেছে কর্পূরের মত মন থেকে। এখন টাক পড়বার অবস্থা, কিন্তু হুঁস নেই সে বিষয়ে। দুশ্চিন্তাটা এমন একটা রোগ যা মাথার চুল পর্যন্ত খসিয়ে ছাড়ে।

খরায় পোড়া ধানচারার মতন ফিনফিনে চুলগুলি মুঠোয় ধরে বিরস মুখে বসে ছিল শরাফত আলী। এখন দিনটা আবার শুরু হবে। শীত-সকালে সূর্যি মামার আড়মোড়া ভাঙতেই ত আটটা। ন্যাড়া মাথা ভরদ্বাজ পন্ডিতের মত গোলগাল চেহারা নিয়ে সে এখন উঠবে ঢিমে তেতালে। বহু কষ্টে মুখের ওপর থেকে মাকড়সার জালের মতন কুয়াশাটা সরিয়ে উঁকি মারবে। টকটকে লাল মুখটি বাড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইবে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে চোখ রাঙানো শুরু হবে। ঠিক সে সময়ে চোখ রাঙানো এদিকেও শুরু হবে শরাফত আলীর সংসারে। আকাশের সূর্যের দাবদাহ সওয়া

www.pathagar.com

যায়, কিন্তু ঘরের গুলোর প্রাখর্য বেশী। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করছে তাকে।

পঁচিশ হাজার টাকায় পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রী করে ট্যাঁকে গুঁজেছিল শরাফত। উদ্দেশ্য ব্যবসা করবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকার বাচ্চা বেরোয়। তখন মূলধনে হাত দেয়ার আর দরকার পড়ে না। আসল খতম হলে আর রইল কি? তাই ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে অষ্টপ্রহর এত ভাবনা চিন্তা। চিন্তা করতে করতেই তার সময় কাটছে হু হু করে। এদিকে গৃহ-সূর্যের প্রখর তাপ ঐ পুঁজিতে ছ্যাঁকা দিতে শুরু করেছে। গল্‌তে গল্‌তে এসে ঠেকেছে পনেরোতে। এখন ত তার ত্রিশংকু অবস্থা! চোরাবালিতে ডুবছে শরাফত। তাই আপন মাথার চুল টানছে ওপর দিকে। ভাবনাগুলো শিমুল তুলোর আঁশের মত। দুশ্চিন্তার পাগলা হওয়ার তাড়া খেয়ে উড়ছে কেবল। সে গুলিকে বাগ মানানোর কোশেশে শরাফত ব্যস্ত, এমন সময় তার খালুজী এলেন। রাহী শিকদার। বিরাট দেহী মানুষ। শরীরের কত ওজন তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। একবার ওজন যন্ত্রে দাঁড়াতে গিয়ে সর্বনাশ করেছিলেন যন্ত্রের মালিক ব্যাটার। ওঠার সাথে সাথে ওপর-নীচ একেবারে এক সাথে মিশে গিয়ে চিড়ে-চ্যাপ্টা। তারপর আর তার ওজন নেয়া হয়নি ইহজীবনে। ভুঁড়িটা শরীরকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে দূরে এগিয়ে চলে। চীৎ হয়ে শুলে মনে হয় আস্ত একটা ছোট খাটো পাহাড় বসে আছে পেটটার ওপরে। একটা হাঙ্গর মুখো পাত্‌লুনের মধ্যে শরীরের নীচের অংশ গলিয়ে দিয়ে, গায়ের হাওয়াই সার্টটা পাতলুনে ইন করে, চ্যাপ্টা চওড়া বেল্ট দিয়ে ভুঁড়িটাকে মোটামুটি জব্দ করে রাস্তায় যখন নামেন তিনি, সারা শরীরের চর্বিঅলা মাংস পেশী গুলো তখন হাঁ কুৎ কুৎ, হাঁ কুৎ কুৎ করে তোলপাড় করতে থাকে। তার সাথে আছে তেরিয়া মেরিয়া হাঁটার লাগাম ছাড়া ফ্রি ষ্টাইল। ছোট খাটো বাহু গুলির বিদ্যুৎগতি অগ্র-পশ্চাৎ-গমন। এহেন দশাসই খালুজীকে অতিপ্রত্যুষে আবির্ভূত হতে দেখে প্রথম চোটে শরাফতের পিলেটা পর্যন্ত একবার চম্‌কে উঠেছিল। কিন্তু সামলে নিল সে হিকমতের সাথে।

কাছে এসে একগাল 'পান মুখ' হাসি হেসে গদ গদ কণ্ঠে বললেন, কি গো বাজান, বইয়া বইয়া কী করত্যাছ?

শরাফত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসেন খালুজান, আসেন আসেন। ওরে ও প্যাটাংগা এঘরে একটা চেয়ার আন্‌তো রে!

—না রে বাপ, অহন চ্যার ট্যার লাগব না কিছু। ব'নের সুমায় নাই, বাজান। বমু অন্য দিন।

প্যাটাংগ্যা একটা চেয়ার এনে হাজির করল এক মুহূর্তে।

রাহী শিকদার তাকালেন চেয়ারের দিকে। করুণ দৃষ্টি। বসার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মনে মনে পরখ করে দেখ্‌লেন তার প্রকান্ড বপুটা ঐ চেয়ার খানার গেল্‌বার সাধ্য নাই। অগত্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ শুরু করলেন, কী কাম কাইজ করত্যাছ বাজান,

www.pathagar.com

কইলা না ত!

—কী করব খালুজান? কোন কাজের ব্যবস্থা ত দেখি না। এ বিরাট একটা সংসার ঘাড়ের 'পরে। ভেবে চিন্তে অন্ধকার দেখ্‌ছি চারদিকে।

এক কদম ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন শিকদার সা'ব। চোখের মনিটা নেচে উঠল ঝিলিক মেরে। বললেন, হের লাইগ্যাই ত আইছি, মিয়া! তুমার লগে কতা কমু হেই বিষয়। আমার নামে একটা ফুড গেরেনের লাইছেন অইছে। লাইছেন করার ঝক্কি ঝামেলা আর অইব না তুমার। তুমি একটা কাম কর, বাজান! তুমি হেইডা লইয়া গম তুইল্যা লও।

শরাফত বোকার দৃষ্টি মেলে তাকাল রাহী শিকদারের দিকে। বলল, কী করব সেই গম?

আবার 'পান-মুখে' লাল টকটকে হাসি হাসলেন শিকদার। বললেন, বেচ্‌বা, কী করবা আবার?

—পারব আমি?

—ক্যান্ পারবানা? মানুষ না তুমি? কোন্ কাম পারে না মানুষে?

শরাফত মাথা চুল্‌কিয়ে বলল, ওর মধ্যে নাকি ঘুষ-ঘাষ হেংকি পেংকি নানান তা করতে হয়?

শিকদারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শরাফতের মুখের ওপর নিবদ্ধ হ'ল। কণ্ঠস্বর কিছুটা নীচু ও গাঢ় হয়ে এলো। বললেন, ফ্যালবা কড়ি মাখবা ত্যাল। ঘুষ ত আর তুমার পকেট তে যাইবে না মিয়া। ট্যাহা আইব, ট্যাহা যাইব, হ্যার লাইগ্যা তুমি ভাবত্যাছ ক্যান?

শরাফত বিরস মুখে বলল, ঘুষ-ঘাষের কাজ ত পছন্দ করি না খালুজান।

মুখের কথা কেড়ে নিলেন শিকদার সাব। তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলেন, না করলে না খাইয়া মরবা মিয়া। য্যামন কলি ত্যামন চলি। একটু থামলেন। তারপর দৃষ্টিটা তার আরো ধারালো, আরো চকচকে হয়ে উঠল। শাণিত দৃষ্টিখানি শরাফতের মলিন মুখে পড়ে জ্বালার অনুভূতি সৃষ্টি করল। শিকদার বললেন, তুমি বুঝি ঐ আলী ডাক্তোরের পাল্লায় পড়ছ মিয়া? হেই ব্যাডা উইড়া আইয়া জুইড়্যা বইছে। অহন পুলাপানগুলির ব্যাক্‌টির মাতা খাইব, দেইখো মিয়া, কইয়া দিলাম।

শরাফত আলী বিস্মিত চাহনি ফেলে বলল, ডাক্তার কী করল খালুজান? ঘুষ-ঘাষের ব্যাপারটা ত কোরআন হাদীসে মানা।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন শিকদার। রাক্ষো মিয়া তুমার হাদীস-কুরান। হাদীস-কুরান মাইন্যা কজন চল্‌ত্যাছে অহন? হাদীস-কুরানে চুমা খাইবা আর মাথার

www.pathagar.com

উপর তুইল্যা রাখবা। ধর্মের জিনিস পাক-পবিত্তর। হেই সব জিনিস ব্যবসা ট্যাবসার মইধ্যে আইনো না মিয়া কোন দিন। বুঝলা?

যুক্তি ও শাসনে চুপ্‌সে গেল শরাফত আলী। খানিকক্ষণ বোকার মত চেয়ে রইল শিকদারের মুখের দিকে। তারপর বলল, তা' হলে কি করতে হবে, বলেন।

—নাজিমদ্দীকে তুমার লগে দিয়া দিমু। হেই হগল কাম ঠিকঠাক কইর‍্যা দিব। তুমি খালি লগে লগে থাকবা। হাজ্জার সুমায় তুমি হিসাবডা একবার দেইখ্যা লইবা, ব্যস। প্রবল একটা থাপ্পড় দিলেন তিনি বাম হাতের ওপরে ডান হাত দিয়ে। তারপর কেল্লাফতের বিজয় গর্বে হাসতে লাগলেন লাল মুখে।

শেষ রক্ত বিন্দুর মত পনের হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসাতে নামল শরাফত আলী। সরকার খাদ্য শস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যায্য মূল্যে গম বরাদ্দ করছেন। সেই গমের সে নেপথ্য ডিলার। খাতা পত্রে রাহী শিকদার। টাকা পয়সায় শরাফত আলী। লাভ লোকসান ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি। আসলে লোকসান ত হয় না। ডিলারের মাল হাতীর মতন। মরলেও লাখ, বাঁচলেও লাখ।

আপন কলিজার চেয়ে দামী টাকাগুলি ট্যাঁকে গুঁজে শরাফত আলী রওনা দিল তেজগাঁ এল. এস. ডি গোডাউনে। সেখানকার রাঘব বোয়ালদের হাঁ যে অত প্রকাণ্ড, তা তার জানা ছিল না আগে। তারা বরাদ্দের গম পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করে। বিলি বন্টনের মামলায় যা একটা ঘাপলাবাজী শুরু হয়, তা দেখে শরাফত আলীর আক্কেল গুড়ুম। ভিখিরীর মতন দেড়-দেড়টা ঘন্টা একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর একজন লোক পাওয়া গেল, যিনি এ, আর, ও, নামে মশহুর। এই দুর্মূল্যের বাজারে গালের চেকনাই আর কাঁধের কাশ্মিরী মলিদা বেতনের পিঠে 'উপরি'র কথা মনে করিয়ে দেয়। ভদ্রলোক ভ্রু-কুঁচকে চোখ দুটি ওপরে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কী চাই?

শরাফত আলী হাতে ধরা ট্রেজারী চালানটা সুমুখে ধরে বলল, এটায় আপনার একটা সিগ্‌নেচার দরকার।

এ, আর, ও সাহেব এ ধরনের 'তোয়াজ-শূন্য' কথা শুনে বিস্মিত হলেন ভয়ানক। রাগের চোটে তাঁর পিত্তি বিগড়ে গেল। তেঁতুল বীচির মত পালিশ করা দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, সিগনেচার যে লাগবে, সেটা আমারও জানা আছে। বাড়িতে যান। সিগনেচার আপনার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসব, বুঝলেন?

কিছুই বুঝতে পারল না শরাফত আলী। বোকার মত দাঁড়িয়েই রইলো ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে।

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে বসে ছিলেন। পুনরায় শরাফতের দিকে তাকালেন। কি, দাঁড়িয়ে রইলেন যে? সেইটে ভালো হবে না?

www.pathagar.com

পাশের দন্ডায়মান চালান অলাদের মুখের হাসিতে শরাফত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠতেই সে এ, আর, ও, সাহেবের সুমুখ থেকে বাইরে চলে এলো।

নাজিমদ্দী সতর্ক দৃষ্টিতে সবকিছু দেখছিল এতক্ষণ। সে এসব ব্যাপারের কায়কারবার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। জীবনে এসব ক্ষেত্রে কোনদিন ঠেকেছে বলে তার মনে পড়ে না। শরাফত আলী ঐ কাজটা ভালভাবে পার করতে পারবে বলে তার ধারণা ছিল। কিন্তু এই অবাক কান্ডটা দেখে সেও অবাক হ'ল খুব। রাগ হল তার ভীষণ। শরাফতের ত্যাবাচ্যাকা চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, হউর সায়েবের কাম নাই, আপনের মতন ব্যাক্কল একটা পাডাইছে আমার লগে। দিলেন ত অহন গন্ডগোল বাজাইয়া! তারপর রাগের সাথে তিরস্কার করে বলল, যান, বন গিয়া হেই মুরা। বলে টেজারী চালানটা নিয়ে হন হন করে চলে গেল এ, আর, ও, সাহেবের কাছে। তিনি তখন সিগারেটে সুখটান দিচ্ছিলেন ঘন ঘন। সুমুখে এক প্যাকেট বিদেশী 'ডান হিল' আধ খোলা পড়ে। ফিল্টার টিপ থেকে ইঞ্চি দেড়েক দূরে থাকতেই ছুঁড়ে ফেলছেন হাতেরটা, তারপর আর একটা আনকোরা শলাকা ঢুঁকে পড়ছে দু'আঙ্গুলের ফাঁকে। মুহূর্মুহূ ভস্মে পরিনত একটার পর একটা শুভ্র শলাকা।

নাজিমদ্দী একটু এগিয়ে গিয়ে বিনয়ের সাথে দাঁড়াল এ, আর, ও, সাহেবের সামনে। কাঁচু মাঁচু করে হাত কচলিয়ে বলল, স্যার!

এ, আর, ও, নির্বিকার মুখে জবাব দিলেন, বলে ফেলেন জল্‌দি।

—হে ব্যাডা অন্যায় কইরা ফেল্‌ছে, স্যার।

এ, আর,ও, তেমনি নির্লিপ্তভাবে বললেন, হুম।

—মাফ কইর‍্যা দ্যান, স্যার।

চালানের কাগজটা টেবিলের ওপর রাখল নাজিমদ্দী। ভাঁজের মধ্যে কড় কড়ে দুখানি নোট। এ, আর,ও, সাহেব এবার মুখের দিকে তাকালেন। দামী কাশ্মিরী মলিদাখানি টেনে বাদশাহী ভঙ্গীতে কাঁধে ফেলে বললেন, এখন হবে না, যান। তিন দিন পরে আসবেন।

—না স্যার, আইজক্যা দেওন লাগবই, স্যার।

এ, আর, ও, সাহেবের দক্ষ কান। কথার আওয়াজে অন্তরের খবর টের পান তিনি। নাজিমদ্দীর কথায় সেই ধরনের একটা সুবাস পাওয়া যায়। ভ্রু কুচকে বললেন, ঐ লোকটা কে?

—আমার খালাতো হুমুন্দি।

www.pathagar.com

—ওকে এনেছেন ক্যানো?

—হেইডা আর জিগাইবেন না, স্যার! আমার হউরের কাম নাই। শিক্ষিত পুলা ভাইব্যা আমার লগে অরে পাডাইছে। ব্যাডা আহম্মুক নাম্বার ওয়ান।

এ, আর, ও, সাহেব বললেন, শিক্ষিত হতে ওর ঢের বাকী। দু'কলম লিখতে পড়তে জানলেই শিক্ষিত হয় না। নির্বোধ একটা। মানুষের সাথে ব্যবহারটা পর্যন্ত জানে না। ওর চেয়ে আপনিই ঢের বুদ্ধিমান, বুঝলেন?

নাজিমদ্দী বিনয়ে গলে গিয়ে হেঁ হেঁ করে হাসতে লাগল।

এ, আর, ও, সাহেব কাগজটা সরিয়ে নোট দু'খানি সন্তর্পণে পকেটে ভরলেন। তারপর খচ্ খচ্ করে স্বাক্ষর দিয়ে দিলেন। বললেন, ওকে আর কোনদিন এখানে আনবেন না, বুঝলেন?

রাজী হয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গীতে পিছু হটতে হটতে বাইরে এসে হাঁপ ছাড়ল নাজিমদ্দী। শরাফত আলী এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল শুধু মুখে। নাজিমদ্দী চোখ ইশারায় ডেকে বলল, অইয়া গেছে, আহেন।

বাইরে এসে বলল, এই লাইনে কাম হিগতে আপনের বহুৎ সুমায় লাগব মিয়া বাই! টেরনিং লাগব। হগল কামেই টেরনিং লাগে, বুজলেন? তহন দেখবেন আপনে আম্‌গোত্তে অনেক এস্‌পার্ট অইয়া যাইবেন গিয়া।

শরাফত আলী পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। তার মুখে কোন কথা সরল না। অফিস থেকে বেরিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে নাজিমদ্দী রিকসা ডাকল, এই খালি যাইব্যা?

—কই?

—ফারুম গেইট।

রিকসা অলা মুখ ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে। বোঝা গেল সে যাবে না। নাজিমদ্দী বলল, না মিয়া বাই অইব না। বেবীত্ কইর‍্যা যাওন লাগব। নাইলে বহুৎ টাইম লাইগ্যা যাইব।

শেষ পর্যন্ত বেবীট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা বাংলাদেশ ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গেল দুইজন। সেখানে পৌঁছে শরাফত লক্ষ্য করল বেশী ঝামেলা নাই। টাকা জমা দেওয়ার কাজ তাদের সহজেই হয়ে গেল এখানে।

কাজ সেরে শহর-রেশন অফিসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে দুপুর হয়ে গেল। নাজিমদ্দী বলল, হেই অফিসডাও হালার ঘাপলাবাজির জা'গা মিয়া বাই। হালার অপিসার কোন্

www.pathagar.com

বাহানা শুরু করে, কওন যায় না। আইয়েন দু'গা নাস্তা খাইয়া লই। পিছনে পিছনে ঢুকল শরাফত মধুমিতা মিষ্টি ঘরে। মিষ্টি-দধি-নিম্‌কির নাশতা সেরে দুজনে আবার এসে পৌঁছুল শহর রেশনিং অফিসে। সেখানে বিতরণ বিভাগের পরিচালকের স্বাক্ষর লাগবে। সুচতুর নাজিমদ্দীর বিড়ালের মতন গোঁফ জোড়া নেচে উঠল। বলল, মিয়া বাই, এইবার আপনের যাওনের কাম নাই। আপনে যাইয়া ব'ন। আমিই দেহি।

নাজিমদ্দী সন্তর্পণে ঢুকল রেশন অফিসে। তাকে দেখতে পেয়ে কেরানী ভদ্রলোক আকর্ণ প্রসারিত খুশীর হাসি হেসে কাছে ডাকল। নাজিমদ্দী জানে, এখানে লট প্রতি একটা বিশেষ হারে সেলামী লাগবে। ঐ সেলামী না দিলে চালানের কাগজপত্র পাথর হয়ে পড়ে থাকবে, একটুও নড়বে না। আর সেলামী পড়বার সাথে সাথে কাগজ পত্রের ডানা গজাবে পাখির মত। উড়ে যাবে সীল-ছাপ্পড়ের দেশে। ফটাফট সব কাম 'কম্‌পিলিট'।

শহর রেশন অফিস থেকে বাইরে এসে আরেকবার হাঁপ ছাড়ল নাজিমদ্দী।

—চলেন মিয়া বাই, আইজকার মতন কাম খতম। দুইডা হাড় কাডার গলি পার অইলাম আমরা। শরাফত আলী জিজ্ঞাসা করল, আর ঐ রকম কটা বাকী আছে, দুলা মিয়া?

—হায় আল্লাহ্! তার ত হিসাব টিশাব নাই, মিয়া বাই। অহন ত মাত্তর শুরু।

পেটের পিলেটা পর্যন্ত চম্‌কালো শরাফতের। বল কী তুমি? এইভাবে গম উঠিয়ে লাভ কী হবে?

—লাভ? একটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হাসি হাসল নাজিমদ্দী। তারপর বুঝিয়ে বলতে লাগল, গম কিনুম একশো পঞ্চাশ ট্যাহা মণে। আটা করতে লাগব তুমার গিয়া পনের ট্যাহা। মণকরা আড়াই সের ঘাট্‌তি যাইব। তারও দাম দরেন গিয়া আপনের বারো ট্যাহা। মোটমাট কত অইল মিয়া বাই?

শরাফত আলী হিসাব কষে বলল, একশো সাতাত্তর টাকা।

হাসিখানি মুখে রেখেই নাজিমদ্দী বলল, দেহেন, একশো সাতাত্তর ট্যাহা আপনের সিধা হিসাবেই অইয়া গেল মিয়া বাই। হেইডা বাদেও আর নানান খরচ ত দরি নাই। তেজগাঁ-এর অফিস চার্চ, শান্তি নগরের অফিস চার্চ, গদাই দুলুগো 'ডিবটি', কাঁঠাল তলার ডিবটি। কারুন বাজার যাইতে যাইতে খাজনার তে বাজনা বেশী অইয়া যাইব মিয়া বাই।

শরাফতের চক্ষু চড়ক গাছ। জিজ্ঞসা করল, তা হ'লে লোকসান যাবে না?

হো হো করে হেসে উঠলো নাজিমদ্দী। মোডেও না। ক্যামন কইর‍্যা তুমার গিয়া

www.pathagar.com

লাভ অয় দেখবেন মিয়া বাই।

সকাল সকাল এল, এস, ডি, গোডাউনে হাজির হল তারা। শরাফত আলী এ লাইনে আনকোরা মানুষ সেটা এখানকার কর্মচারীদের চোখে ধরা পড়ল যথারীতি। নাজিমদ্দী চেয়েছিল শরাফত দূরেই থাক্। কিন্তু হ'ল না সেটা। ঐখানে সে একটু বেঁকে বসল। ব্যবসা-বাণিজ্য শেখার জিনিস। সেটা ম্যালেরিয়ার কুইনিন নয় যে যতই তেতো হোক না কেন, আপ্‌সে আপ্ নলী দিয়ে নেমে যাবে। ব্যবসা করতে হলে হাতে কলমে শিখতে হবে। ঠেকবে আর শিখবে শরাফত আলী। তাই বাধা ঠেলে তাকে এল, এস, ডি গোডাউনে আসতে হল বাধ্য হয়ে।

এখানেও মোক্ষম একটা পরামর্শ দিল নাজিমদ্দী। কিন্তু শরাফত আলী একটা আস্ত হাবা। হাবা-মানুষের মগজে কস্মিন কালেও ভাল পরামর্শ ঢুকতে চায় না। তাই সে পরামর্শের ধারে কাছে গেল না। একটু হিসেব পত্তর করে দেখল, এখানে সেলামী টেলামীর জন্যে সোজাসুজি কোন বাহানা নেই। সুতরাং পারা গেলে ট্যাকের পয়সা কিছু বাঁচবে। সেটা মন্দ কি? এবার একটা চাল মারল শরাফত আলী। একটা পয়সাও খরচ করল না। নাজিমদ্দী ভাবসাব দেখে আর কিছু বলল না। সেলামী লাগল না, গমও বেরিয়ে এলো তর তর করে। সে গম দোকানেও পৌঁছুল যথারীতি। কিন্তু দোকানে পৌঁছিয়েই আসল ব্যাপারটা টের পাওয়া গেল। শরাফতের চালের ধারালো ফালটা উল্টা বুমেরাং হয়ে ঢুকেছে তার আপন পেটে। গম হাতে নিয়ে খরিদ্দাররা 'উয়াক থু' শুরু করল। দুর্গন্ধ! দুর্গন্ধ!! একেবারে পচা গম! মাথায় হাত দিল শরাফত আলী। চোখে তার সর্ষের ফুল ফুটতে লাগল।

এবার কাছে এলো নাজিমদ্দী।

—আমি আগেই কইছিলাম, আপনে ত হুনলেন না মিয়া বাই। মণকরা দশ ট্যাহা দিলে একেবারে হাদা গম পাওয়া যাইত। এই জামেলা আর অইত না।

শরাফত আলী অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকাল নাজিমদ্দীর দিকে। ভুল যা হবার তা ত হয়েই গেল। এখন কী করা যায়?

এক গাল হাসল নাজিমদ্দী। বলল, চিন্তা কইরেন না, মিয়াবাই। ঠিক কইর‍্যা দেওন যাইব। আমি ঠিক কইর‍্যা দিমু।

তারপর সাদা গম বা'র করার ব্যাপারে শরাফত আলী আর মোড়লী করতে যায়নি। নাজিমদ্দী যা ভাল বুঝে করুক, এই ছিল তার কথা।

মণ প্রতি দশ টাকা বাড়তি সেলামী দিয়ে সাদা গমের বস্তা এনে হাসি মুখে দাঁড়াল নাজিমদ্দী। বলল, দ্যাহেন মিয়া বাই, ক্যামুন স্বর্ণের মতন গম পাইছি। এইবার হালার

www.pathagar.com

হুর হুর কইর‍্যা বিক্‌ব দেখবেন।

গমের বস্তা দোকানে সাজিয়ে শরাফত আলীকে সাথে নিয়ে নাজিমদ্দী রাহী শিকদারের কাছে হাজির হ'ল। শিকদার তখন গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দেহের তুলনায় ছোট ছোট হাতগুলি দিয়ে মাংসল শরীরটার ওপর থপ্ থপ্ করে তেল দিচ্ছিলেন রোদে বসে।

—বাজান আপ্‌নের লগে একটা পরামিশ করন লাগব। নাজিমদ্দী বলল।

ফিরে তাকালেন রাহী শিকদার। কী পরামিশ কও বাজী, হুনি।

—মিয়া বাই ত বড় রকমের ছ্যাক খাইছিল গেল বার গম উডাইয়া। কইলাম, কিছু মালপানি ছাড়ন লাগব মিয়া বাই, নইলে হালারা বেবাক পঁচা গম মাইর‍্যা দিব। হুন্‌ল না। শ্যাষ ম্যাশ যা কইলাম, অইলও তাই।

—তারপর কী করলা বাজী? জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন রাহী শিকদার।

—দিলাম বাজান মণ করা দশ ট্যাহা। দেহেন গিয়া ক্যায়সা স্বর্ণের মতন গম দিছে এইবার।

শরাফতের অপ্রতিভ মুখের দিকে তাকালেন রাহী শিকদার। তারপর খুব খুশীর চোটে বার কয়েক মাথা নাড়লেন তিনি। সেই মাথা নাড়ার মধ্যে শরাফতের নির্বুদ্ধিতার ওপর নাজিমদ্দীর বাহাদুরীটা প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

রাহী শিখদার বললেন, এদ্দূরই যহন করলা বাজী, বাহীডাও ঠিক ঠাক মতন কইর‍্যা দেও। তারপর দুজনকে ডেকে তিনি পরামর্শ দিতে লাগলেন। একেক জনরে তিন সের কইর‍্যা মাল দেওনের অর্ডার। দুই সের কইর‍্যা চালাইয়া যাও। দুই সংখ্যাডা খুব চালাকীতে লিখবা, মিয়া। ইনেস্‌পেক্টার আইলে ফট কইর‍্যা তিন বানাইয়া দিবা। আর ঐ ব্যাডারে খালি হাতে ফিরাইবা না খবরদার, বুঝলা? সরকারী মানুষের চেতাইতে নাই। হেরা ছাই দিয়া দরি পাকাইতে জানে। বও বাজান, গোছলডা সাইর‍্যা লই। শহরে যামু। জলদি করত্যাছি।

গোসলের জন্য উঠে গেলেন রাহী শিকদার।

সকাল আটটা থেকে গম বিক্রয় শুরু হল। জন প্রতি দুই সের। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেছে খরিদ্দারা। ধাক্কাধাক্কি ঠেলাপাড়া করতেই হা-ভেতে খরিদ্দারদের সময় যায়। শস্যের চেয়ে ধাক্কাই পায় বেশী। ডেলী সাত মণ গম বিক্রী করার অর্ডার। দুই মণ বিক্রী করেই শেষ করা হয়। বাকী পাঁচমণ প্রতিদিন জমা হয়। তারপর সুযোগ মত এক

www.pathagar.com

সময় ফজর নামাজের ঘন্টা খানেক আগে তাল তলা হয়ে কারুন বাজারে চালান হয়ে যায়। সেখান থেকে কালো বাজারীর ঘাড়ে চড়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। ন্যায্য মূল্যের সরকারী গম, অন্যায্য মূল্যের সমস্ত সীমা-সরহদ ছাড়িয়ে যায়। তাও বিক্রী হয়ে যায় গরম জিলাপীর মত হুড় হুড় করে।

খাদ্য বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর আসেন মোটর সাইকেলে চড়ে। দোকানের সামনে নামা মাত্র জামাই আদর শুরু হয়ে যায়। কলা-বিস্কুট-চা আসে চক্ষের পলকে। সাহেবের প্রকান্ড টাকে রৌদ্র লেগে চিক্ চিক্ করে। নাজিমদ্দীর বুকে দরদ উথলে ওঠে। বলে, কি করেন মিয়া বাই, যান সায়েবের মাতায় ছাতিডা দরেন গিয়া!

উস্‌খুস্ করে শরাফত আলী। চারিদিকে তাকায়। তারপর কাঁচুমাচু করে বলে, তুমিই যাও, দুলা মিয়া!

হাসে নাজিমদ্দী। শরম করে মিয়া বাই? বেবাক ঠিক অইয়া যাইব দেইখ্যেন। টেরনিং লাগব, বুইজ্‌লেন? বলে হাস্‌তে হাস্‌তে ছাতাটা ফুটিয়ে ধরে সাহেবের মাথায়। টাক্‌টা তাঁর রৌদ্র থেকে রক্ষা পায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে নাজিমদ্দীর বিশেষ একটা সুব্যবহারে ইন্‌সপেক্টর সাহেব যথেষ্ট খুশী হয়ে যান। খাতাপত্র তদন্তের প্রয়োজন যায় শেষ হয়ে । দুমুহূর্তের মধ্যে ভট্ ভট্ আওয়াজ তুলে ইন্‌সপেক্টর সাহেবের লাল হোন্ডাটি অদৃশ্য হয়ে যায়।

ভোর রাত্রে খান কয়েক রিকসা দোকানের সামনে ভিড়ে। গদাই 'ডিবটি অলা' টল্‌তে টল্‌তে এসে রিকসার পেছনে দাঁড়ায়। সারারাত্রি গেলাস গেলাস এলকো টেনে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল শিমুল তলায়। ভোরের হাওয়া আর রিকসার খুট্ খাট্ আওয়াজে নেশা ভেঙ্গেছে। তাছাড়া হোমিও ডাক্তার গরীবুল্লা এলকোতে আজকাল পানি মিশায় বেশী। নেশা খুব গাঢ় হতে চায় না। এছাড়াও আছে প্রয়োজনের তাগাদা। সময় মত ঘুম না ভাঙ্গলে গমভর্তি রিকসাগুলি হাওয়া হবে। তাহ'লেই ফক্কা! ডাক্তার গরীবুল্লাহ এলকোর দাম বাড়িয়ে তিনগুণ করেছে। তা নিয়ে চেঁচামেচি করলে বলবে, নাই। বাকী ত দেবেই না। এ ব্যবসা বাকী চলে না। গরীবুল্লাহর সাফ কথা। সুতরাং যতই আলসেমি লাগুক, গা ঝাড়া দিতেই হয় গদাইকে। কিছু মালপানি খসাতেই হবে।

একটা রিকসার 'কামানী'তে হাত রেখে ঘুম আর নেশা জড়িত কণ্ঠে গদাই বলল, এই নাইজ্যা!

নাজিমদ্দী খেঁকিয়ে ওঠে চাপা কণ্ঠে, চোপ্ হালার পো হালা!

দাঁত বার করে হাসে গদাই। কৃতার্থের হাসি। সে জানে নাজিমদ্দী যখন খিস্তি

www.pathagar.com

করছে, তখন ফল শুভ হবে। গালাগাল দিলেই জানতে হবে অল্পক্ষণ পরে ট্যাঁকে হাত দেবে সে। তারপর কিছু মালপানি বার করে ছুঁড়ে মারবে গদাইয়ের দিকে। হাসি মুখে ওটা কুড়িয়ে নিয়ে ওখান থেকে সরে আসবে। তারপর শিমূল তলায় পড়ে থাকবে যতক্ষণ না রোদের তাপে আবার হুঁশ ফিরে আসে।

রিকসা তাল তলায় পৌঁছে একটু থামে। থামলেই জানতে হবে এখানে যারা 'ডিউটি'তে আছে তাদের যথারীতি 'মান্য' করা হল। চুপে চুপে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে অবস্থা গুরুতর। প্রথমে হান্টারের 'ঠুকুনি' দেবে, তারপর যতদূর সম্ভব 'চিপে চিপে' রস বার করে নেবে। নাজিমদ্দী পালায় না। বরং জায়গা মত পৌঁছে রিকসাঅলাকে বেল দিতে বলে। আধো ঘুম জড়িত 'ডিবটি অলা' পিট্ পিট্ করে তাকাতে তাকাতে এসে দাঁড়ায় সুমুখে। কাঁধের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গমের বস্তায় খোঁচা মারে ঘচাং করে। ঝাঁটার মত গোঁফ জোড়া ফুলে ওঠে পুরু পুরু ঠোঁটের ওপরে।

—এই রেট আর চলব না, মিয়া! বাড়ান্ লাগ্‌ব।

—মোডেও ব্যবসা নাই বাইজান, লুশ্‌কান খাইত্যাছি অহন।

—আম্‌গোরও হেই অবস্থা, মিয়া! আম্‌গোর সা'ব কম পয়সা দেখলে ক্ষেইপ্যা যায়। মোডেও বিশ্বাস করবার চায় না।

কাঁচুমাচু করে নাজিমদ্দী। বহু অনুনয় বিনয় করে বলে, মইর‍্যা যাইত্যাছি মিয়া বাই। চালান ভাইঙ্গা খাইত্যাছি অহন।

ঘাটায় না আর 'ডিবটি অলা'। জোঁক যেমন শরীর থেকে মুখ সরিয়ে নেয় তেমনিভাবে মুখ সরিয়ে নেয় তাল তলার 'ডিবটি অলা'। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা সাথীর কাছে খটখট বুটের আওয়াজ তুলে সে চলে যায়।

নাজিমদ্দী রিকসাঅলাকে তাড়া দেয়, জলদি চালা, ব্যাডা উল্লুক।

কারুন বাজার পৌঁছুতে পৌঁছুতে পূব আকাশটা রাঙা হয়ে ওঠে। নিশাচর কালোবাজারীরা ওঁৎ পেতে আছে। মাল পেলে টাকা গুঁজে দিয়ে সুড়ুৎ করে কেটে পড়বে। সেখানে নাজিমদ্দী মশহুর ব্যক্তি। শরাফত আলীর দরকার হয়নি। তাছাড়া সে ইচ্ছে করেই যায়নি। আবার কোন গিট্টু বাধে কে জানে! ক'দিন খুব ধকল গেছে তার। ফজর বাদ তাই একটু গড়াগড়ি দিচ্ছিল শরাফত। আজ ফজর নামাজের মধ্যে ঐ আয়াতখানি তার বুকের পাঁজরে দারুণ একটা ঘা দিয়েছে। 'ইন্নাছ্ ছলাতা তান্‌হা আনিল ফাহ্‌শায়ি ওয়াল মুনকার'—নিশ্চয়ই নামাজ মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। সত্যি কি তা হচ্ছে শরাফতের? সে ত খারাপ কাজের মধ্যেই জড়িয়ে পড়ছে তরতর করে। চারদিকে ঘুষ দিয়ে দিয়ে চাঙ্গা করতে হচ্ছে ব্যবসাকে। অথচ ছাত্র জীবনে সে

www.pathagar.com

মুখস্থ করেছিল একখানি হাদীস, ঘুষ দেনেঅলা ও লেনেঅলা উভয়েই জাহান্নামী। তাহ'লে তার নামাজ কি কবুল হচ্ছে না আল্লাহ্‌র দরবারে? ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে পড়ল শরাফত। উঠে বসল বিছানার ওপরে। মনে পড়ল নাজিমদ্দী জবাবে বলেছিল, আপনের মতন মুল্লা-মুন্সী অইলে কাম চলবো না। দুনিয়াদারী মাটি অইয়া যাইব, মিয়া বাই। হেল্লাইগ্যাই ত নুমাজ ছাড়ছি। নুমাজও পড়ুম, আবার আকাম-কুকামও করুম, তা অয়না। দুইডা কাম এক লগে করন যায় না। মুনডার মইধ্যে খুঁৎ খুঁৎ করে। মানষে বিজ্‌লায়। নুমাজ ছাড়ছি অহন আর ক্যাউ কিছু কয় না।

শরাফতের মাথার মধ্যে ভন্ ভন্ করতে থাকে ঐ কথাটা। শরাফতের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। নামাজ অপকর্ম ছাড়াবে, না অপকর্ম নামাজ ছাড়াবে, সেটার চূড়ান্ত ফয়সালা হবে এবার।

বহুদিন পূর্বের একখানি ছবি মনের পর্দায় ভেসে উঠল তার। দাদীর কাছে শুয়ে শুয়ে সে শুনত কেয়ামতের বর্ণনা। সেইদিন এক সূর্যের বারো মুখ হবে। মাটি পুড়ে তামা হবে। মাথার মগজ গলে গলে পড়বে। ঘামের দরিয়ায় মানুষ সাঁতার কাটবে। অপরাধীদের সেদিন কোন আশ্রয় থাকবে না। ভয়াবহ সেই দোজখের আগুনের বর্ণনা শুনে কলিজা শুকিয়ে যেত ভয়ে। আজ বহুদিন পর, সেই কথা মনে পড়ল তার। ভয়ানক আতংকিত হল শরাফত। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর যন্ত্র চালিতের মত হাজির হল গিয়ে রাহী শিকদারের বাড়ি।

শিকদার তখন নাশ্‌তার পর বড় একটা পান চিবাচ্ছিলেন জোরে জোরে।

শরাফতকে দেখে একমুহূর্ত চমকে উঠলেন তিনি। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, আইও বাজান, বও।

শরাফত আলী বসল একটা টুলের ওপর। রাহী শিকদার নিজেও একটা টুল টেনে নিয়ে বসলেন। তারপর চাপা কণ্ঠে বললেন, একটা মোছিবৎ গইট্যা গেছে বাজান, হুনছনি?

শরাফত আলী ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে তাকাল শিকদারের মুখের দিকে।

রাহী শিকদার বলতে লাগলেন, নাজিমদ্দীর পকেট তে পকেটমার বেবাক ট্যাহা লই গেছে বাজান। হেই ব্যাডা ত কাইন্দা কাইট্যা বেহুঁশ। হুঁশিয়ার মানুষ। তা অইলে কী অইব? কফাল খারাব অইলে হেই আর কী করব কও?

শরাফত আলীর বাকরুদ্ধ অবস্থা। মুখে একটি কথাও এলো না তার।

রাহী শিকদার অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, যা অইবার তা ত অইয়া গেছে বাজান।

www.pathagar.com

হেইডা লইয়া আর হাউকাউ কইরো না তুমি। আমিই তুমার ট্যাহা ম্যানেজ কইর‍্যা দিমু। তুমি ঘাবড়াইও না বাজান.....। বলে তেমনি ঘন ঘন পান চিবুতে লাগলেন রাহী শিকদার।

শরাফত আলী ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, রাহী শিকদারের লাল টকটকে মোটামোটা ঠোঁট জোড়া। মনে হচ্ছে শরাফতের কলিজা চিবানো রক্তে ওটা লাল হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

তরল সন্ধ্যেটা ভারি গাঢ় হয়ে উঠেছে। আঁধার চিরে চিরে নিয়নের দুধ-শাদা আলো চুমকীর মতন ঝিক ঝিক করছে। ঠাহর করলে দেখা যাবে কাল্লুর চোখ দুটোও ঠিক্‌রে পড়া আলোতে ঝিকিয়ে উঠেছে এখন। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবে এখনই।

গাট্টাগোট্টা মানুষটা। দৈর্ঘে না বাড়লেও প্রস্থে ঢের বেড়েছে। গায়ে হাতে মেদ মাংস জমে কিছুটা গোলগাল হয়ে উঠেছে। মুখমন্ডল গোলগাল। ঠোঁটের অল্প একটু ওপরে ঝুলে পড়া থ্যাবড়ানো নাক। নাক-মুখের মাঝখানে একগুচ্ছ ঝাঁটা খিলে গোঁফ। মাথার চুলগুলি আকাশমুখো কদম ছাঁটে কাটা। কালাচাঁদ থেকে কাল্লুতে সঠিক উত্তরণ।

কালাচাঁদ নিশ্চিন্দিপুরের বাসিন্দা ছিল। ঢের দিন আগে গ্রাম ছাড়তে হয়েছে তাকে। আসার পর আর ফেরেনি। এসেছিল কাজের খোঁজে। পাড়াগাঁগুলো শহরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। পল্লী অঞ্চল এখন দুঃখ-কষ্টের আস্তানা। ঝড় ঝঞ্ঝা বানভাসি ত লেগেই আছে। মানুষের জীবনে কোনো সুখ শান্তি নেই। নদীর ভাঙ্গনে বাপ-দাদার ভিটেমাটি তলিয়ে গেলে কালাচাঁদকে গ্রামের মায়া ছাড়তে হয়। সেও শহরের পথ ধরে। গ্রামে বাস করলে নিজের পেটটাও একটা বোঝার মতন। বানভাসিতে সর্বস্বান্ত মানুষেরা উঠে আসে শহরে। শহর ধনী-দরিদ্র সবারই আশ্রয়। সর্বংসহা। ফেলে না কাউকে। ধনীরা থাকে দুধশাদা তুলতুলে বিছানায় আর গরীবরা উদোম ফুটপাতে। তবু এটাও শহরের দয়া। আর জীবিকার জন্যে কাজও কিছু না কিছু মিলে যায়।

শহরে এসেও প্রথমে অনেক ঠোক্কর খেতে হয়েছিল কালাচাঁদকে। মানুষ চট করে বিশ্বাস করতে চায় না। কাজ করার নামে বাসায় ঢুকে ধুয়ে মুছে নিয়ে চম্পট দেবে না, কে বলতে পারে? কিন্তু শেষমেশ ওকে দয়া করেছিল চিরকুট। পথের ধার ঘেঁষে ক্যানাস্ত্রা টিনের দোচালা ঘর চিরকুটের চা-দোকান। সে দোকানেই শুকনো মুখে অনেকক্ষণ কালাচাঁদ দাঁড়িয়েছিল। চিরকুট লোকটা যে খুব দরাজ দিল, তা নয়। চায়ের বাকী পয়সার জন্যে কাষ্টোমারের জামা পর্যন্ত সে খুলে নিতে পারে। কিন্তু অমন একটা মানুষ কালাচাঁদকে দয়া করে বসল।

ক্লান্ত ক্ষুধার্ত কালাচাঁদকে একপেট খাইয়ে হাতে একটা তালপাতার পাখা দিয়ে কয়লার চুলোটা উসকাতে লাগিয়ে দিয়েছিল চিরকুট। তারপর কর্মরত কালাচাঁদকে শুধিয়েছিল, তেরা নাম কি আছে রে?

—নাম? নাম কালাচাঁদ।

—কেলাচাঁদ? এ তো সালে বুদ্ধু কা নাম, মালউন কা নাম! ইয়ে নাম নেহী চলবে, সমঝো? আজ সে তুমহারা নাম হোবে কাল্লু, কাল্লু খান। ঠিক হ্যায়?

www.pathagar.com

দয়ায় অভিভূত কালাচাঁদ ঘাড় কাৎ করে সায় দিয়েছিল। এখন সে উল্লুক খানও হতে রাজী।

চিরকুটের আদি বাড়ি পশ্চিমের কোন শহর জব্বল পুর না মজফফর পুরে। দেশ বিভাগের দুবছর পর ভেগে এসেছিল এই দেশে। হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তানে। প্রাণ নিয়ে দারুণ কষ্ট গেছে ওর। কেটলির পানির মত টগবগ করে ফুটতে হয়েছে সে সময়। জীবনটা মুঠোয় ভরে মাইলের পর মাইল তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে। মুখে জপতে জপতে এসেছে বাপের শেখানো বুলিটি, ইয়া হাফিজো, ইয়া হাফিজো, ইয়া হাফিজো ...।

একদিন যখন সে বুঝল, জীবনের চারপাশের উত্তাপ কমে গিয়েছে। অমনি ছুঁড়ে ফেলে দিল বাপের দেয়া তস্‌বিহ্‌। জীবনটাকে সে ঢেলে সাজাল যুগের চাহিদা মত। এখন ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে একটু ফুরসৎ মিললে, ক্যাশ বাকসোটায় চাঁটি মেরে বেসুরো হেঁড়ে গলায় গেয়ে ওঠে, দেখোজী চাঁদ নিক্‌লা, পিছে খজুর কি... ডিপ... ডিপ... ডিপ...

কাল্লুর সব কিছু মনে পড়ে। যেন সিনেমা দেখছে সে। চিরকুটের জীবনে সেবার জুৎসই মওকা এল একটা। সেটা আন্দাজ করেই সে ফূর্তিতে একেবারে মেতে উঠল। ওর পান খাওয়া মুখটা দেখে কাল্লু ভাবল, একটা খ্যাপা কুকুর দেখছে সে। সেদিন সন্ধ্যের পর কেমন রহস্যময় হয়ে উঠল শহরটা। লাশকাটা ঘরের সম্মুখের নির্জন পথটা সেই রাত্তিরে জেগে উঠেছিল। মানুষের দুড়দাড় ছুটোছুটিতে কেমন রহস্যঘন ব্যাপার স্যাপার। এই রামদাখানি সেদিন জড়ানো ছিল চিরকুটের লুঙ্গিতে। চিরকুট ওকে কাছে ডেকে ফিস ফিস করে বলেছিল, ই ধার আও কাল্লু, তুম লোগ কো এক কাম করতে হোবে।

—কি! অবাক হয়ে শুধিয়েছিল কালাচাঁদ।

—মিল পাড়া মে আজ একশান হোবে, সমঝো?

—একশান? সে আবার কি?

—আরে বুদ্দু, একশান কিয়া নেহী মালুম হইতেছে? হোবে হোবে, দেখনে সে হো যায়েগা।

সত্যি সত্যিই কাল্লুর মালুম হয়েছিল একশান কাকে বলে। চিরকুটের সাথে সাথে যেতে হয়েছিল কালাচাঁদকেও। চিরকুটের হাতে রামদা আর কাল্লুর হাতে জিন্দা বাঁশের লাঠি। কিন্তু শুধু শুধু লাঠি আর রামদা দিয়েই তোমার একশানের কাজ হয় না। আসল

www.pathagar.com

জিনিস হচ্ছে সাধনার 'মৃত সঞ্জীবনী'। রামদা আর লাঠি তো সে-ই চালাবে। শুধু একেক জনের জন্যে একেক বোতল দরকার। হিন্দুস্থানে নাকি মুসলমান মারছে, এই ত সুযোগ। সেই সুযোগেই এবার শালা সুজিতের গলাটা তার ধড়টা থেকে আলাদা করতে হবে। খুশীতে চিরকুট বাগ্ বাগ্।

চিরকুট বলে, পিও ইয়ার।

বোতলের মুখ খুলে খানিকটা গলায় ঢেলেই কালাচাঁদের মুখটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম প্রথম কি না! বলেছিল, এটা আমি গিলতে পারছি না। বুক জ্বলে যাচ্ছে। কী এটা?

হা হা করে হেসে উঠেছিল চিরকুট, কী ইটা, ইটা তো পিয়ার কী চাবি ইয়ার, সমঝো? রাত কি সাঁথি। তুমলোগ যাকে বোলো মদ।

—মদ! কাল্লু সেদিন চমকে উঠেছিল। এটা মদ? মদ খাওয়া না হারাম?

—হারাম! বোতলের শেষ বিন্দুটুকু গলায় ঢেলে বলেছিল চিরকুট, সালে হামার মুলবি আছে রে! পাক্কা মুলবি আছে। বলেই হা হা করে হেসে উঠেছিল চিরকুট।

কালাচাঁদ ওর মুসল্লী বাপের কাছে শুনেছিল, মদ খাওয়া হারাম। মুসলমান কোনদিন ঐ হারাম জিনিস ছুঁতে পারে না। গ্রাম দেশে ঐ সব বোতল টোতল কোনদিন দেখেইনি সে। কারুর কোন নেশা থাকলেও, তা ঐ বিড়ি টিড়ি পর্যন্ত। ইন্ডিয়া থেকে টেন্ডু পাতার চালান বন্ধ হবার পর তার বদলে মানুষ দুটো একটা 'ছিকরেট' টানে। কালাচাঁদেরও অল্পসল্প সেই অভ্যেস আছে।

সে ফ্যাসফেসে গলায় বলেছিল, মদ আমি খেতে পারব না, চিরকুট ভাই।

চিরকুটের তখন নেশা ধরেছে খুব। বলে, আগর নেহী খাবে তো ভাগো, ভাগো হিঁয়াসে। মূলবি সাহেবকো হামার দরকার না আছে। আবে কিয়া করোগে? খাওগে অর যাওগে? এক বাৎ বাতাও।

বহু কষ্টের আশ্রয়। হারাবার ভয়ে কাল্লু আঁধার দেখেছিলো চোখে। এখন না গিলে উপায় নেই। ফাঁটা বাঁশের মাঝখানে পড়েছে কাল্লু। বলে, দ্যাও। বলেই গলায় ঢালতে গিয়ে ওর কলজেটা পর্যন্ত জ্বলে উঠেছিল। তারপর কিছুক্ষণ বাদ কেমন ফুরফুরে ভাব। একেবারে রাজার বাবা রাজা।

তারপরই লাশকাটা ঘরের পাশের পথটা ধরে টলতে টলতে ছুটেছিল ওরা। শুধু ওরা নয়, দলে দলে লোক। যার যেদিকে ইচ্ছা। চিরকুটের লক্ষ্য ছিল সুজিতের ঘরের দিকে। কতদিন ঘোরাফেরা করেছে চিরকুট সেখানে। সুজিতের বৌ মাধুরীকে দেখেই

www.pathagar.com

একদিন সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সালা ঝাড়ুদারের ঘরে অমন চোখ ঝলসানো মেয়ে মানুষ? কী অবাক করা রূপ! ছিপ ছিপে একহারা মেয়ে মানুষটার কোমরটা দারুণ সরু। দুহাতের আঙ্গুলের ঘেরে ধরা যায়। একে ত ফর্সা দুধে আলতায়, তার ওপর টকটকে লালশাড়ী পরে চিরকুটের মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছে মাধুরী। সুন্দর হাসি হাসি মুখ! রাস্তায় চললে চিরকুটের মনে হয় ভরা নদী একটা যেন উথাল পাথাল করছে। সালা, সুজিত জমাদ্দার ভাগিয়ে এনেছে নাকি? না সে-ই পালিয়ে এসেছে কোন ভাল মানুষের ঘর ভেঙ্গে? দেখে তো মনে হয় দারুণ সেক্সি। শেষের কথাটি তখন সদ্য সদ্য শিখেছে সে কলেজ-পড়া তরুণদের কাছে। ওরা দোকানে চা খেতে এসে পথ চলতি ছাত্রীদের লক্ষ্য করে ঐ কথাটি বলে। তার থেকেই শিখে নিয়েছে চিরকুট।

বহুদিনের সাধ আজ পূর্ণ করবে চিরকুট। পূর্ণ হবার মওকা মিলেছে এবার। ফূর্তির চোটে রামদাখানি মাথার ওপর ঘুরাল একবার। একটুকুনির জন্যে কাল্লুর মাথাটায় লাগেনি। বড়ডো বেঁচে গেছে। আর এদিকে চিরকুট নাচল বেদম ভেল্কি নাচ। ফূর্তিতে সে বেহুঁশ।

সুজিতের ছাপরা ঘরখানি মিলপাড়ায় ঢুকতে পথের ধারে। পথে ঘাটে বিজলী বাতি নেই। লোড শেডিং নাকি, কে জানে! মানুষ জনের সাড়া শব্দ নেই। একশনের কথা টের পেয়েছে নাকি? সুজিতের ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে টেমির আলো মিটমিট করে দেখা যাচ্ছে। জীবনের অস্তিত্ব বুঝা যায়।

দরজায় লাথি পড়তেই দূর্বল খিলটা ফটাম করে ভেঙ্গে যায়। হাট হয়ে খুলে যায় দরজা। সুজিত জমাদ্দার দেখেই বুঝে ফেলে এটা তার মৃত্যুর পরোয়ানা। মাধুরীও। মরার আগে লড়তে যায় সুজিত। মাছ কোটা বটি নিয়েই সে উঠোনে নামে। খুব ধীরপায়ে এগিয়ে আসে চিরকুটের দিকে। চিরকুট চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে কাল্লু!

কালাচাঁদ আঁধার থেকে এক মুহূর্তে বেরিয়ে এসে সাঁই করে লাঠি বসায় সুজিতের হাতের কব্জির ওপর। ছিটকে পড়ে সুজিতের বটি। আর অমনি চিরকুট ঝাঁপিয়ে পড়ে সুজিতের ওপর। একটা গোঙানীর পরই নিস্পন্দ হয়ে যায় সুজিতের দেহ।

ধীরে ধীরে মাধুরীর কাছে এগিয়ে আসে চিরকুট। খামুশ! মাধুরী আগেই খামুশ হয়ে আছে। কেমন হতবাক আর ভীতিময় চাহনি। চিরকুট শুধায়, যাওগে? ক্যা, যাও গে?

মাধুরী রুদ্ধ গলায় শুধায়, কঁহা?

—মেরে সাথ? চিরকুটের তির্যক চাহনিতে আগুন।

ওর রামদার দিকে চোখ পড়ে মাধুরীর। টেমির আলোতে রক্তমাখা রামদাখানি ঝলসে ওঠে। মাধুরী বাঁচতে চায়। চারিদিকে মৃত্যুর ঘোরলাগা অন্ধকারে মাধুরী জীবনের আলো চায়। বলে, মেরে লে চলো যাঁহা খুশী, লেকিন হামকো বাঁচাও, বাঁচাও... খুন

www.pathagar.com

মাৎ করো।

চিরকুটের মুখে হাসি ফোটে। খুব সহজ বিজয়। বলে, আ যা মেরে সাঁথ। আ যা...

মাধুরী সুজিতের মৃতদেহ ডিঙিয়ে উঠে আসে চিরকুটের কাছে। তারপর বন্দিনী হরিণীর মত তাকায় ভয়ার্ত চোখে।

এবার তিনজন পথে নামে। আগে চিরকুট মাঝে মাধুরী আর পেছনে কালাচাঁদ। সেই রাত্রির কথা এই মুহূর্তে জ্বল জ্বল করে ভাসছে কালাচাঁদের চোখে। এই তো সেদিনের ঘটনা মনে হয়।

বেঁচে আছে মাধুরী। হতবাক মাধুরীর মুখে কথা ফুটেছে। তার মুখ থেকে মিলিয়ে যাওয়া হাসি আবার কেমন করে যেন ফিরে এসেছে। সুজিতের ঘর অন্ধকার কিন্তু আলো জ্বলছে চিরকুটের ঘরে। অতীতের সেই চিত্র কালাচাদ এখন দারুণ মজাসে উপভোগ করছে। সে যদি সুজিতের হাতের ওপর লাঠির ঘা না দিত, তাহলে চিরকুট কোথায় পেত মাধুরীকে। যুদ্ধ করেছে কাল্লু কিন্তু ভোগ করেছে একলা চিরকুট। সালা এ্যায়সা হারামী!

সুজিতের ঘরে চিরকুটের চোখ যেমন কুঁই কুঁই করেছে, ঠিক তেমনি চিরকুটের ঘরে কাল্লুর চোখও কুঁই কুঁই করেছে এতদিন। মাধুরী চিরকুটের কি একার? কিন্তু একাই তো সে দখল করে রাখল এতটা কাল। শালা বিহারীদের ছিল পোয়া বারো। ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরী বাকরী সব ওদের। দোকান পাট, কলোনী বাড়ি সব দিয়েছে আয়ুব খাঁ। তেরিয়া মেরিয়া বলে বলে শালারা দোস্তি করেছে পাঞ্জাবীদের সাথে। হবে না?

সেই শক্তিতেই এতদিন মাধুরীকেও সে একলা দখল করে রেখেছিল। ওর কাছে ঘেষা দূরের কথা, ওর দিকে দৃষ্টি দিলেও চোখে ড্যাগার বসাবে এমনই যেন ভাবখানা। কিন্তু তাহলে কি হবে? মাধুরীর দিকে তাকালে কাল্লুরও যে নেশা ধরে। অসাধারণ মেয়ে মানুষ ঐটি। হাত বদল হল বটে, কিন্তু রঙ বদল হল না। প্রথম দিকে কাল্লুরও ভাগ আছে আন্দাজ করত মাধুরী। কিন্তু শেষ তক সে বুঝে ফেলেছে, চিরকুটের কাছে তার কোনই পাত্তা নাই। কাল্লু শক্তিহীন। শক্তিহীনকে কে পাত্তা দেয়?

কিন্তু হঠাৎ করেই বাতাসটা গেল পাল্টে। ব্যাটা আয়ুব খাঁ গদী ছেড়ে পালাল, আর সেটা দখল করল ইয়াহিয়া। সেও দাবাতে চাইল বাঙ্গালীকে কিন্তু এবার পারল না। উহুঁ, আর বাঙ্গালীদের দাবাতে পারবা না। বাতাস বুঝেই চিরকুট টের পেয়ে গেল, কাল্লু এবার জাগছে। জাগরণের রক্তধারা শিরায় শিরায় তার টলমল করে উঠছে। এক একটা মিছিল সড়ক দিয়ে যাচ্ছে, আর তার শ্লোগান শুনে কাল্লুর চোখ দুটো দারুণ ঝিকমিকিয়ে

www.pathagar.com

উঠছে। আর চিরকুটের চোখের জ্যোতি ম্লান হয়ে আসছে। এবার চিরকুট খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মনে হয় সে আর চিরকুট নেই। কখন তার অজ্ঞাতসারেই সে হঠাৎ সুজিত হয়ে উঠেছে। আর ঐ কাল্লু, ঐ এখন যেন চিরকুট। তেমনি চালচলন, আচার ব্যবহার, চোখ মুখের ভাবসাব। এবার মাধুরীর ভাগটা ওকে না দিয়ে উপায় কি? ভাগেই কি সন্তুষ্ট হবে কাল্লু? চিরকুট কি সন্তুষ্ট হয়েছিল? মনে হয় কাল্লু মাধুরীকে ভাগে নেবে না এবার। এবার তার পুরো সুন্দরীটাই চাই।

সুজিতের ঘরের সেই 'একশনের' দিনে অন্ধকার নামার সুযোগ হয়েছিল। সুজিতের উপর চিরকুটরা চড়াও হয়েছিল রাতের বেলা। কিন্তু আজ দিনের বেলায় কাল্লুর চোখ দেখে চিরকুট স্পষ্ট বুঝে ফেলেছে, আসলে ও দু'টো কাল্লুর চোখ নয়। তার বদলে চিরকুটের সেই 'একশনে'র দিনের চোখ দুটো ওখানে বসে হিংস্র দৃষ্টি ফেলছে। তা দেখে দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছে চিরকুট। এখন আর মাধুরীকে দরকার নেই তার। শুধুমাত্র নিজের জীবনটাকেই সে বাচাঁতে চায়। ভারত থেকে পালিয়ে আসার সময় বাপের শেখানো কি একটা কথা বলতে বলতে এসেছিল চিরকুট। এখন আর কিছুতেই মনে আসছে না তার একটি শব্দও। আউড়ে দেখতে পারত। সেই মজফফরপুর এখন অনেক দূর। ফেরার পথ চিরকুট হারিয়ে ফেলেছে। পাকিস্তানে সে এসেছিল মুসলমান হওয়ার কারণে। কিন্তু মদ আর মাধুরীদের নেশা তাকে একদিনও মুসলমান থাকতে দেয়নি। কাল্লুকেও সে মুসলমান বানানোর বদলে শাণিয়ে শাণিয়ে একখানি খড়্গ বানিয়েছে। সেই খড়্গ এখন তার শিরের উপরই ঝুলছে।

মিছিল এল। কাল্লুদের জাগরণের দুর্বার মিছিলটা রাজপথ মুখরিত করে দিয়ে গেল। চিরকুট খোঁজ নিয়ে দেখল কাল্লু নেই। মিছিলের আওয়াজ শুনে মাধুরীর দৃষ্টিটাও দিনকে দিন শাণিত হয়ে উঠছে। হিন্দী ভাষী হলেও মাধুরীর ভয় নেই। তার আসল পরিচয়ে ফিরে গেলে সে বেঁচে যাবে। সে যদি বলে, আমি সুজিতের বৌ মাধুরী, তাহলে কেউ তাকে আর কিছু বলবে'না। কিন্তু চিরকুট? কী করে বাঁচবে সে? আজকে যদি সুজিত বেঁচে থাকত, সেও বেঁচে যেত। বাঁচা মরার অধিকারের কী অদ্ভুত রকমফের হয়!

ঘরের ভেতর দৃষ্টি ফেলে রামদাখানি খুঁজেছিল চিরকুট। তার নিজের মৃত্যুর পর মাধুরী বেঁচে থাকুক, সেটা সে চায় না। কিন্তু রামদা নেই। রামদা এবং কাল্লু এই মুহূর্তে দুইই উধাও। বেঁচে গেল মাধুরী। সে যদি বাঁচে চিরকুটকেও তাহলে বাঁচতে হবে। এখনই বেরিয়ে পড়া দরকার। যেদিকে দুচোখ যায়। বাঘ আর বাঘিনীর উদ্যত থাবা এখন মাথার উপর। পালাও চিরকুট, পালাও।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে বড় সড়কে উঠল এবার। চারদিকে দৃষ্টি ফেলল। পালাবার পথ ঐ একটি। লাশকাটা ঘরের পাশ দিয়ে সোজা পুবের দিকে নির্জন শুনশান পথ। কলোনীর পথটুকু পাড়ি দিতেই ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে তার নিজের দোচালা ক্যানাস্ত্রা ছাওয়া চায়ের দোকান। তাকাল সে। সেখানে আজ আর কোন আকর্ষণ অবশিষ্ট নেই।

www.pathagar.com

সন্ধ্যেয় কেবল দূরাগত একটি পরিচিত আওয়াজ ওর কানে এসে লাগছে। বাঙ্গালী মুসলমান পাড়ায় একখানি পুরোনো খ্যারখেরে গ্রামোফোন রেকর্ড ছ্যাকড়া মাইকের হেঁড়ে গলায় গাঁক গাঁক করছে,

দেখোজ্বী চাঁদ নিকলা পিছে খজুর কি,

বস্‌রে কি হুর নাচে আগে হুজুর কি....

চিরকুটের বড়ই প্রিয় সেই 'গানা'। এখন বড়্ডো তেতো ঠেকছে।

পথটি নির্জন আর নিঃশব্দ। লাশকাটা ঘরের কাছে পৌঁছুতেই সেই নির্জনতা হঠাৎ করে খান খান হয়ে ভেঙে গেল। চিরকুটের সামনে একটা গাট্টা গোট্টা মানুষ। নিশাচর হিংস্র প্রাণীর মতন জ্বলন্ত তার চোখ। তার সেই সংগ্রামী দিনের সাথী কাল্লু। হাতে তার চিরকুটেরই ঝকমকে সেই রামদা।

দেখেই চিরকুট পালাতে চেয়েছিল। কাল্লু পালাতে দেয়নি। কারণ তার বুকের ওপর পা রেখে চিরকুট এতদিন মাধুরীকে...। সালা এ্যায়সা হারামী।

লাশকাটা ঘরের পাশে ক্ষীণ আর্তনাদটা থেমে গেলে কাল্লু ঘরে ফিরবে। কিছুদূর পথ হাঁটলে ওর ডান দিকে মজা পুকুর। রামদাখানি সেখানে সে ছুঁড়ে ফেলবে। চিরকুটের লাশ পড়ে থাক। এখন কত বিহারীর লাশই তো থাকছে পড়ে। আরো কিছুদূর এগোলে বাম হাতে পড়বে চিরকুটের চায়ের দোকান। ঐ দোকানের র‍্যাকের ওপর দুবোতল 'মৃত সঞ্জীবনী' লুকানো আছে। কাল্লু ঝাঁপ খুলে বোতল দুটো পেড়ে নেবে। এক বোতল তার আর এক বোতল মাধুরীর। দরজায় টোকা মারলেই মাধুরী দরজা খুলে দেবে। সুজিতের পর চিরকুটকেও দিয়েছিল। তারপর কাল্লু ভেতরে গিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দেবে। আর খুলবে না রাত্রিভর। মিছিল গেলেও না, শ্লোগান উঠলেও না।

www.pathagar.com

উৎকণ্ঠা

গুল্‌তির বাঁটুল ছুঁড়েছিলাম বাঁশ ঝাড়ে বসা একটা পাখির দিকে। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে লাগল গিয়ে অন্য জায়গায়। ঠাস করে একটা আওয়াজ উঠল। এক পা দু পা করে এগিয়ে দেখি, পুরনো পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। কাঁখে মাটির কলস। কলসের সবটুকু পানি তার শাড়ির একাংশ ভিজিয়ে মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে ফিরে গেছে পুকুরে।

অবস্থা অনুমান করতে এক মুহূর্ত দেরি হয়নি। পিঠটান দেবার আয়োজন করেছিলাম। পারিনি। মেয়েটির চোখের ওপর চোখ পড়তেই শরীরটা আমার কাঠ হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলাম প্রস্তর মূর্তির মতন।

তার চোখ দুটি যেন গোলাকার দুটি অগ্নিপিন্ড হয়ে উঠেছে। আমি যদি পালাতে যাই তবে সে আগুন হয়ত আমাকে ভস্মিভূত করে ফেলবে। আমার নিজেরই কৃতকর্মের জন্যে বুকটার ভেতরে জ্বালানি অনুভব করলাম। অনুশোচনা হল দারুণ। কিন্তু সে অনুশোচনার কথাটি তাকে জানাবার সাহস হল না!

মেয়েটির মুখখানি ফর্সা। পরনে ডুরেদার দেশী তাঁতের শাড়ি। সস্তা সাদামাটা। এমন জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন জায়গায় তাকে দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না!

কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই মনে হল হঠাৎ কোথায় যেন একরাশ বেলোয়াড়ির আওয়াজ উঠল। ভাল করে তাকিয়ে দেখি মেয়েটি হাসছে খিল খিল করে। তার ঐ অগ্নিমূর্তির অন্তরালে কোথায় যে অমন অবারিত হাসির ফল্গু ধারা লুকিয়েছিল, সেই জানে। বহুকাল পরেও তার সেই পরস্পর বিরোধী আচরণের কার্য কারণটি আমি আবিস্কার করতে পারি নি।

আমি তখন হতভম্ব।

তার হাসি কিছুতেই থামে না। ঘন আঁশশেওড়া, ভাঁট, ভূতরাজা আর কালকাসুন্দী গাছে ছাওয়া এই বিজন বনভূমিতে, মজে-যাওয়া জঙ্গলাকীর্ণ পুকুর পাড়ে তার এই বিস্ময়কর আচরণ আমাকে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো অশরীরী কোন কোন জীবাত্মার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এই নির্জন দুপুরে আমার সারা শরীরে তখন দারুণ ঘাম ছুটেছে। আমি কাঁপতে লাগলাম ঠকঠক করে। আমার তখন যা বয়স আর সাহস, তাতে আরো কিছু করে ফেলাও বিচিত্র নয়।

মেয়েটিই পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। কাছে এসে মুখ খুলল, কোথায় থাকো?

পরিস্কার কথা। কোন জড়তার নাম-গন্ধ নেই। মানুষের মতই।

www.pathagar.com

ভয়ের মধ্যেও আমার বুকে সামান্য সাহসের সঞ্চার হল। কতকটা ইশারায় দেখিয়ে বললাম, ওখানে।

—ওখানে? কোথায়?

বল্‌লাম, ওই যে ওই পাড়ায়।

বলল, ভূঁইয়া পাড়ায়?

বললাম, হাঁ।

—এই জঙ্গলে কী করতে এসেছো?

হাতের গুলতিটা দেখিয়ে বললাম, পাখি মারতে।

—পাখি মারতে, না কলস ভাঙতে? গলায় সহসা তার গাম্ভীর্য ফুটে উঠল।

আমার মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। খুব বিনয়ের সাথে বললাম, বিশ্বাস করো, আমি তোমার কলসি দেখতেই পাইনি। কঞ্চিতে বসা একটা ঘুঘুর দিকে বাঁটুল ছুঁড়তেই ...

—লেগে গেল কলসিতে, তাইতো? এই কলসির দাম কত জানো?

এবার আমার সামান্য সাহস হল। বললাম, কত হবে দাম? দাম যা চাও দেব। কত দাম বলো।

মেয়েটি এবার রুষ্ট হয়ে উঠল, ভূঁইয়া বাড়ির ছেলে তো, তোমাদের পয়সার খুব গরম। যাচ্ছে তাই করবে, দাম যা লাগে দিয়ে দেবে, তাই না? এ কলসির দাম অত সস্তা নয়। এর দাম দিতে গেলে তোমার মুন্ডুটা বিক্রী হয়ে যাবে, জানো?

—মুন্ডু! আমি এমনিতেই ভয় কাতুরে। নির্জন বনবাদাড়ে পাখি মেরে বেড়ানো আমার খুব পছন্দ। বনভূমির নির্জনতা আমার কাছে ভিন্ন এক ধরনের সৌন্দর্য নিয়ে দেখা দেয়। আমাকে এই রকম চলাফেরার জন্যে মুরুব্বিরা, বিশেষ করে আমার দাদী, বারণও করেন। কবে কোথায় মুন্ডু হারাবি বলে ভয়ও দেখান। সেই জিনিসটাই আজ বাস্তবে রূপ নিল নাকি?

আমার হতভম্ব মূর্তি দেখে মেয়েটি বলল, আজকের মতন ছেড়ে দিলাম। আর কোন দিন যদি কলস ভাঙো তা হলে সুদশুদ্ধ দাম আদায় করে নেব। যাও, বাড়ি যাও।

আমি পরিত্রাণ পেয়ে এক মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলোম। গেলাম তো কিন্তু তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। সেই দুখিনীর চোখের পানি আমারও অনেক অশ্রু ক্ষরণের কারণ হবে? একটি শুভ্র

www.pathagar.com

শুকতারার মতো সে সারাটি জীবন ফুটে থাকবে মনের আকাশে।

নাম তার ময়না। বেদের মেয়ে। ময়নামতী।

স্রোতের শ্যাওলার মতন এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়ায় বেদেরা। সঙ্গে থাকে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় লটবহর। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিজন নিয়ে দল বেঁধে তারা দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। পথ চলতে চলতে সুযোগমত এক এক জায়গায় আশ্রয় নেয়, সংসার পাতে। যতদিন তাদের ভাল লাগে, ততদিনই তারা সেখানে বসবাস করে। প্রয়োজনের উপকরণ যেদিন ফুরোয়, সেদিনই তারা বোচকা-বুচকি, লটবহর কাঁধে করে আবার নামে পথে। পাড়ি দেয় আরো কোন একটা অজানা অঞ্চলে।

এই স্রোতের শ্যাওলা হয়েই একদিন ময়নামতীরা উঠে এসেছিল আমাদের ভূঁইয়া পাড়ার পুবের জঙ্গলাকীর্ণ মধুবনে। মধুবনের একাংশ ছিল সায়েবদের নীলকুঠি। শতাব্দী কালেরও আগের সেই নীলকুঠির সমস্ত কায়কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। এখন জঙ্গলের অভ্যন্তরে পড়ে আছে জরাজীর্ণ কাঁটাগাছে ঘেরা এক ঝুরঝুরে পোড়োবাড়ি। মানুষ-জনের বসবাস নেই বলে সেখানে বাস করে রাশি রাশি চামচিকা। রাত্রে বিশ্রাম নেয় বন্যপ্রাণী, শেয়াল, সাপ আর বেজি।

মধুবনের একান্তে মিঠাপুকুর। বড় বড় পানায় আকীর্ণ হয়ে আছে তার বুক। পুবদিকে শান বাঁধানো ঘাটলা। কালের অমোঘ নিয়মে তার পাড়ের শান গিয়েছে ক্ষয়ে। দাঁত বার-করা ইটগুলি পড়ো-পড়ো হয়ে আছে শতাব্দীর সাক্ষী হয়ে।

এই মিঠাপুকুর থেকে একশো গজ দূরে সামারভীলের ভিটে বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে বেদেরা। দলপতি তাদের হীরু বেদে। সেই হীরু বেদেরই মেয়ে ময়না মতী।

এই প্রথম যাযাবর শ্রেণীর মানুষের সাথে আমার দেখা। তার আগে আর কখনো আমি বেদের দল দেখিনি। পুকুর পাড়ে ময়নামতীর কলসি ভাঙায় যে কৌতূহল জাগল, সেদিন সেই কৌতূহলই আমাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়েছিল সামারভীল সাহেবের ভিটে বাড়িতে। ভূঁইয়া পাড়ার ছেলেবুড়ো ভীড় করেছে সেখানে। একদল কালো কালো চেহারার মানুষ সেখানে জমা হয়েছে। রুক্ষ রুক্ষ গা, মাথায় সব উস্কো-খুস্কো চুল। চারদিকে লটবহর ছড়ানো। বাচ্চা কাচ্চার ক্যাঁ-কোঁ। মেয়ে মানুষের কিচির মিচির কথাবার্তা চলছে। একপাশে একটা জ্যান্ত শেয়াল শেকলে বাঁধা। জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। তার পাশেই নির্বিকার ঠ্যাং বিছিয়ে শুয়ে আছে এক তাগড়া মতন ডাল কুত্তা। এক জায়গায় খেলে বেড়াচ্ছে ছোট্ট একটা বেজির বাচ্চা। তার পাশেই একপাল মুরগী আর ছোট ছোট মুরগীর বাচ্চা চরে বেড়াচ্ছে নিরুদ্বেগে।

www.pathagar.com

আমরা দলবেঁধে এইসব অদ্ভুত কান্ডকারখানা দেখে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ চোখ পড়ে গেল উত্তরে লিচু গাছের গুড়ি বরাবর ছোট্ট একটি তাঁবুর মতন জায়গায়। সবুজ পত্রপুঞ্জের নীচে চোখে পড়লো ফুট ফুটে পদ্মের মতন সেই মেয়েটিকে। সে আনমনে কৃষ্ণ কালো দীর্ঘ চুলের গোছার ভেতর অনবরত চিরণী চালিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখেই আমার বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল।

কিন্তু সেদিন সে যে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে, সেই কথাটি মনে পড়তেই বুকে সাহস এলো। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই মেয়েটি চিরুণী রেখে উঠে দাঁড়াল। পরনে আজ সেই ময়লা ডুরেদার শাড়ি নেই। তার বদলে পরেছে একখানি লালপেড়ে হলুদ শাড়ি। গায়েও দিয়েছে রক্তলাল ব্লাউজ। আমাদের দিকে মহারাণীর মতন গম্ভীর পদক্ষেপে সে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি তখন এক দঙ্গল ছেলেপুলের ভিড়ে তলিয়ে আছি। আর আমার মতন চৌদ্দ-পনের বছরের পুঁচকে ছোকরার পাত্তাই বা কে দেবে? মেয়েটি আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল কোন একটা কাজে। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল। হাসি মুখে বলল, কে তুমি?

আমি লজ্জা শরমে একেবারে মাটির মধ্যে মিশে গেলাম।

বলল, আমাকে চিনতে পারছ না?

বললাম, হ্যাঁ পারছি।

—এখনও ভাবছ নাকি কলসির দাম আদায় করে নেব?

—দাম তো দিতেই চেয়েছিলাম, এখন আবার ...

তার বেলোয়াড়ি হাসির আওয়াজে আমার বক্তব্য তলিয়ে গেল। বলল, ঐ দেখ, কলসি আনিয়ে নিয়েছি। আর তোমার ভয় নেই।

দেখলাম, সত্যি সত্যি লিচু গাছের গুঁড়ির কাছে নতুন একটা কলসি উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

বাড়ি ফেরবার সময় পাড়ার ছেলেদের কাছে লজ্জা পাব কি, আমি একেবারে হিরো বনে গেলাম!

বেদেদের সাথে আলাপ পরিচয় হওয়া সে কি চাট্টিখানি কথা! সারাদিন গুলতি বাঁটুল নিয়ে টো টো করে ঘুরলেও একটি কানা চড়ুই, তাই শিকার করা যায় না। আর বেদেরা সাতনলা দিয়ে সুড়ুৎ করে গাছের মগডাল থেকে ঘুঘু মারে। আমার সাথে বেদের মেয়ের যখন আলাপ হয়েছে তখন নির্ঘাৎ আমি একটা সাতনলা পেয়ে যেতে পারি। তখন পাখি শিকারে আমার সাথে পারে কে?

www.pathagar.com

আমার নিজের মনেও লোভ জাগল। সেই লোভে পরের দিনও সকাল সকাল সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম, প্রৌঢ় হীরু বেদে তখন দোতারাটায় টুং টাং সুর তুলছে। তার পাশে বসেছে ছোট ছোট দুটি ছেলে। তাদের একজনের হাতে ছোট ছোট এক জোড়া কাঠ। আর তাদের সামনে নিবিষ্ট মনে বসে আছেন আমাদের আরিফ ভাই। হাতে তাঁর নোট বুক আর আঙুলের ফাঁকে দামী পার্কার কলম।

আমাদের বড় চাচার ছেলে, ভূঁইয়া বাড়ির উদীয়মান কবি আরিফুর রহমান বরাবরই সাহিত্যপ্রেমী মানুষ। তার লেখা তখন পত্র-পত্রিকায় দেদার প্রকাশিত হচ্ছে। কলেজের তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেই তাঁর মধ্যে লালনগীতি সংগ্রহ করবার এক প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। তথাকথিত দেহতত্ত্ব গানের খবর পেলেই আরিফ ভাই তার সন্ধানে সেখানে গিয়ে হাজির হন। সেই সুবাদেই তিনি এসেছেন এই হীরু বেদের সঙ্গীতের আখড়ায়।

তখন এসব বুঝবার মতন যথেষ্ট বয়স আমার হয়নি। তবু সুরের যে একটা মাদকতা আছে, সেই বয়সেই মনে মনে আমি তা টের পেয়ে গেলাম। হীরু বেদের দোতারার সুর ক্রমেই ঘনীভূত হল। পত্রপুঞ্জের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে-সুর পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। আমিও অনুভব করলাম প্রকৃতির মধ্যেও হীরু বেদের যন্ত্রের সুর উন্মাতাল হয়ে উঠেছে। আমি তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হীরু বেদে সেই সুরের সাথে তার কণ্ঠ মিলাল। প্রৌঢ় মানুষটির কণ্ঠ থেকে যেন বাঁশির ধ্বনি উপচে পড়ছে। দেরে মাওলা .... দেরে মাওলা.... এই শব্দটুকুতে ভর করে সুরের বৈচিত্র্যময় নানা ভঙ্গি আমাদের তখন মন্ত্র-মুগ্ধ করে ফেলেছে। জীবনে এমন গান আর কখনো শুনেছি বলে আমার মনে পড়ে না।

সঙ্গীতের সাগরে আমরা যখন সবাই ডুবে আছি, ঠিক তখনই আমার একবার চোখ পড়ল লিচুগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে থাকা সেই মেয়েটির দিকে। ভাবগম্ভীর দৃষ্টি তার স্থির নিবদ্ধ হয়ে আছে আরিফ ভাই-এর মুখের দিকে।

ব্যস্! আমি এটুকুই দেখেছিলাম। আর বেশি কিছু দেখিনি, বেশি কিছু জানতেও পারি নি। সত্যি বলতে কি, তখন তার চেয়ে বেশি বুঝবার মতন বয়সও আমার ছিল না।

ঠিক পনের দিন পরের ঘটনা। হঠাৎ সংবাদ রটে গেল আরিফ ভাইকে পাওয়া যাচ্ছে না। চারদিকে হৈ চৈ বেধে গেল। সবার মুখে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে, আরিফুর রহমান বেদের মেয়ে ময়নাকে নিয়ে ভেগেছে। শুধু ভাগেই নি। শহরে নিয়ে তাকে নাকি বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে।

সবচেয়ে বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন আমার বড় চাচা শরীফুর রহমান ভূঁইয়া।

www.pathagar.com

রাগের চোটে তিনি লাঠিয়াল বাহিনী লাগিয়ে তখনি বেদের বসতি ভেঙ্গে তচনচ করে দিলেন। আহত হীরু বেদে দলবল নিয়ে একদিনের মধ্যেই মধুবন ছেড়ে পালিয়ে গেল।

শরীফুর রহমান এতটুকু করেই ক্ষান্ত হলেন না। পুত্রের সমস্ত সুযোগ-সুবিধাও দিলেন বন্ধ করে। আরিফ ভাই-এর লেখাপড়া গেল বন্ধ হয়ে। আমাদের দাদী কেমন করে ময়না ভাবীকে দেখে ফেলেছিলেন। ময়না ভাবীর সুন্দর মুখখানি দেখে দাদী অবশ্যি বড় চাচার কাছে এ বিয়ে মেনে নেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেন, মেয়েটি যখন মুসলমান হয়ে বিয়ে করেছে, তখন ওকে আর তোমরা ফেলে দিও না।

বড় চাচা গর্জন করে উঠেছিলেন, সেটা কিছুতেই হতে পারবে না। তাকে যদি ঘরে আনা হয়, তবে ভুঁইয়াদের উঁচু মাথা ভূলুণ্ঠিত হয়ে যাবে।

ভয়ে ভয়ে দাদীও আর উচ্চবাচ্য করেন নি।

সেই মেয়েটি যে আমার ভাবী হয়েছে আমি কিন্তু সেকথা জানতে পেয়ে মনে মনে খুবই আনন্দিত। আমার কেন যেন মনে হয়েছিল অমন সুন্দর মেয়েটি বেদের ঘরে একেবারেই বেমানান। আরিফ ভাই-এর ঘরেই সে তার যোগ্য আসন পাবে। সেদিন থেকেই ময়না ভাবীকে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে একটা আকাঙ্খা আমি দিনরাতই অনুভব করতাম। ঠিকানা সংগ্রহের অপেক্ষায় দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতাম। শহরে কেউ গেলেই তার কাছে আরিফ ভাই-এর ঠিকানা জানতে চাইতাম। কিন্তু সে ঠিকানা পেতে পেতে বেশ কিছুদিন দেরী হয়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় বাজারের কয়েৎবেল তলায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় পিলু দরজি এসে আমার কানে কানে বলল, আরিফ মিয়াকে দেখে এলাম বাপু শহরে।

আমি বললাম, ঠিকানাটা জানেন?

পিলু দরজি বলল, ঠিকানা কী করবে? যেতে চাও আমার সাথে যেও। আমি তোমাকে বাসা দেখিয়ে দেব।

দরজি একদিন সাথে করে নিয়ে গিয়ে আমাকে বাসাটা দেখিয়ে দিল। দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে সেই সুপরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ পেলাম, কে? জবাব দিলাম, আমি। আমার গলার আওয়াজ বুঝতে পেরেই বোধহয় সে চট করে দরজাটা খুলে দিল। আমি ময়না ভাবীকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ছোট একটা ঘর। ঘরে আসবাবের বালাই নেই। এক পাশে নড়বড়ে একটা চৌকি। তার ওপর বিছানাপত্রে দীনতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। ছোট্ট একটা মোড়া বেড়ার পাশে। একমাত্র বসার আসন।

বনের মুক্ত বিহঙ্গী খাঁচায় বন্দী হয়েছে। এ বন্দী দশা আমার চোখে সত্যি সত্যি করুণ বলে প্রতিভাত হল।

www.pathagar.com

আমাকে সে মোড়াটা দেখিয়ে বলল, বসো ভাই।

আমি বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলাম, আরিফ ভাই কোথায়?

—কোথায় গেছে বলতে পারব না। তুমি আমাদের বাসার খোঁজ পেলে কেমন করে?

আমি আগাগোড়া সবই তাকে জানালাম।

ময়না ভাবী আমাদের বাড়ির সব খবর পই পই করে জেনে নিলেন। চাচার অনমনীয় মনোভাবের কথাটিও তাকে জানাতে হল। শুনে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

আমার কেমন যেন সন্দেহ-সন্দেহ লাগছে। আরিফ ভাই কোথায় গেছে, তার খোঁজই রাখে না। ব্যাপারটা তাহ'লে কী? বললাম, আরিফ ভাই কি আসেই না নাকি?

ময়না ভাবী ম্লান হাসি হাসল। বলল, আসবে না কেন? আমার জন্যেই তো তার এত দুঃখ-কষ্ট। না এসে কি পারে? সারাদিন কোথায় কোথায় কাজের খোঁজে ফেরে। বড় লোকের ছেলে, আজ আমার জন্যে যে কষ্টে পড়েছে ...

তার বর্ণনা শুনে আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আমি গোপন করে ফেললাম।

অল্প কিছুক্ষণ আলাপ-সালাপের পর ময়না ভাবী বলল, তুমি বসো ভাই, আমি তোমার জন্যে খান দুই রুটি সেঁকে আনি।

তাদের দীনতা দেখে আমার ভাল লাগছিল না। বললাম, থাক ভাবী। এখন আমার খিদেই নেই।

আমার মুখের ভাবী ডাক শুনে বোধহয় সে আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না। চোখ ফেটে তার পানি গড়িয়ে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর ময়না ভাবীই বলল, ওর কষ্ট দেখলে আমার সহ্য হয় না। এক-একবার ভাবি ওকে ফেলে চলে যাই। কিন্তু জানো ভাই, মানুষটিকে এমন ভাবে ফেলে যেতে আমার বুক ভেঙ্গে যায়। আমি সোঁতের শ্যাওলা। আবার হয়ত ভেসে যেতে পারব। কিন্তু ও? ও যে সহ্য করতেই পারবে না। বড়লোকের ছেলে হাতের কোন কাজ-কাম জানে না। চাকরীও একটা জুটছে না। হাতের-পাতের যা ছিল শেষ করে এখন দারুণ বিপাকে পড়েছে।

ময়না ভাবীর সাথে আলাপ করতে গিয়ে বারবার মনে হচ্ছিল, সেই উচ্ছল প্রাণচঞ্চল মানুষটি আজ কেমন যেন হয়ে গেছে। আজ সে একটি মূর্তিমতি অশ্রুপিন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেমের কাছে আত্মাহুতি দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

আমার হয়ত আরো কিছুক্ষণ থাকা হত। কিন্তু পিলু দরজির সময় ছিল না। বিকেলের গাড়িতেই বাড়ি ফেরার কথা। সেই মোতাবেক সে ফিরে এসে দরজার কড়া নাড়ল। আমি ময়না ভাবীর অশ্রুসিক্ত রুটি, অল্প একটু ঝোলাগুড় আর তার নিজের রুচিমত মাজা ঘষা ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে এক গেলাস পানি খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, বাড়িতে গিয়ে যে করেই হোক কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করে ওদের জন্যে পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু টাকা আমাকে আর পাঠাতে হয়নি। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আরিফ ভাইকে ফিরে পেয়ে চাচাজান খুশী হয়ে উঠলেন। আরিফ ভাই তখন বদ্ধ পাগল। মুখে তার ভাষা নেই। নির্বাক বোবা হয়ে বসে থাকেন সব সময়। কখনো দৈবাৎ মুখ খুললে বলেন, আমাকে ফেলে সে চলে যেতে পারল? চাচাজান সে কথায় বড় একটা কান দেন না। ছেলে পাগল হয়েছে, সেও ভাল। বংশের ইজ্জত তো রক্ষা পেয়েছে?

এই কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি। কিন্তু কাকতালীয় একটি ঘটনা কাহিনীটিকে আর একবার আমার স্মরণে এনে দিল। জরিপের কাজে একবার আমাকে উত্তরবঙ্গের এক পল্লী অঞ্চলে যেতে হয়। একটি বাগানের ধার ঘেঁষে আমার পথ। পথের ধারে একদল বেদে আস্তানা গেড়েছে। কত শত বেদের দলই তো ঐ রকম আস্তানা গাড়ে। সেদিকে খেয়াল দেবার অবসর কোথায়? আমার গরুর গাড়িটি ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় কানে হঠাৎ একটি গানের কলি পৌঁছুল। আমি গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাতে বললাম। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে দেখলাম, একজন বৃদ্ধ লোক দোতারায় সুর তুলে গাইছে 'দেরে মাওলা'। মাথায় তার কাশফুলের মতন শুভ্র চুল। দু'জন ছেলে কাঠ ও হাঁড়ি বাজাচ্ছে। সবকিছু দেখে বছর বিশেক আগের দেখা আমার কৈশোর জীবনের সেই মর্মছেঁড়া ঘটনাটির কথা মনে পড়ে গেল।

বৃদ্ধের চোখের জ্যোতি গেছে কমে। শরীরের চামড়া গেছে ঝুলে। কিন্তু তবু আমার মনে হল, এই লোকটিকে আমি চিনি। মধুবনের সামারভীল ভিটায় এই লোকটিই হয়ত আস্তানা গেড়েছিল দেড় যুগ আগে। গান থামলে আমি প্রশ্ন করলাম, বাবাজীর নাম কি?

সে জবাব দিল, আমার নাম বাবু, হীরু।

আমার কাছে সব কিছুই এবার স্পষ্ট হয়ে গেল। একথা-সেকথায় কয়েকটি মুহূর্ত কাটতেই দেখি একটি ষোড়শী মেয়ে গাছকোমর করে কাপড় পরে এক গেলাস দুধ এনে রাখল হীরু বেদের সামনে। মেয়েটিকে হঠাৎ দেখেই আমার অবাক হওয়ার পালা। এ যে অবিকল সেই ময়না মতী!

www.pathagar.com

আমি অভিভূত হয়ে কয়েক মুহূর্ত মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অবিকল সেই মুখ-চোখ, কোঁকড়ানো মাথার চুল, সবই তার।

আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম, এই মেয়েটি কে গাইন?

সে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, আমার নাতিন, বাবু।

আমার কৌতূহল তখন বেড়েই চলেছে। আমি উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম, ওর মা কোথায়?

হীরু বেদে এবার কুত কুতে চোখে আমার আপাদমস্তক ভাল করে একবার দেখে নিল। তারপর কী বুঝল সেই জানে। উত্তর দিল, উয়ার মা মইরে গেছে।

—মরে গেছে! খচ করে বুকের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করলাম। তারপর মনে হল আহা রে, সেই বন্দী বিহঙ্গী তাহলে মুক্তি পেয়েছে! কথাটি শুনে আমার বুকটাও হালকা হয়ে গেল।

বাকী কথা জিজ্ঞেস করতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ হীরু বেদে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নিজেই সে কাহিনীর বর্ণনা দিতে শুরু করল। এই বর্ণনার ভেতরেই তার যেন স্বস্তি। এখন তার পরপারের ডাক এসেছে। জীবনের কোন ঘটনাই সে আর রাখি-ঢাকি করে বলে না। ময়নাকে নিঃসন্তানা স্ত্রীর প্ররোচনায় কীভাবে সে চুরি করে এনেছিল, কীভাবে সতর্কতার সাথে সে তাকে মানুষ করেছিল, নানা কষ্টের মধ্যেও কীভাবে সে কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখিয়েছিল, সবই বর্ণনা করল। তার পরের ঘটনার সবটুকুই তো আমার জানা। শুধুমাত্র শেষেরটুকুই অজানা ছিল। সেটুকুও সে আমাকে শুনিয়ে দিল।

হীরু বেদে বলল, মাকে যখন একটা বড়লোকের ছেইল্যা বিয়া করল, তখুন আমি বুঝলুম, মায়ের আমার জায়গা মতন ঠাঁই হয়ে গেল। কিন্তু কিছুদিন বাদে দেখি মাকে তারা লয় নাই। বহুৎ পথ হাঁটে, বহুৎ কষ্ট ক'রে মা আবার ফিরে এয়েছেল গো .... তারপরে এই মুনিয়াকে ছ' মাসেরটি রাইখ্যে মা আমার চইলে গেল। বৃদ্ধ হীরু এবার গুব গুব করে ডুকরে উঠল।

মেয়েটি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। এসব কাহিনী বুড়া যখন তখন যাকে- তাকে বলে, তা বোধকরি তার পছন্দ নয়। নানাকে সে তাড়া দিয়ে বলল, দুধটুকু খেয়ে নাও, নানু। সেই পরিস্কার ময়না ভাবীর কণ্ঠস্বর।

আমার বোধকরি ঘন্টা খানেকের মতন সময় এইভাবে কেটে গেল। এই সময়টুকুর মধ্যেই দেখলাম, একজন নৌজোয়ান ধোপদুরস্ত কাপড় পরে টু-টু বোর রাইফেল হাতে

www.pathagar.com

আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি ওকে দেখেই ফিক করে হেসে উঠল।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, মুনিয়া, কই রেডি হও নি? যাবে না?

মেয়েটি কেমন অদ্ভুত চাহনি মেলে ঠোঁট উল্টে বলল, না না।

আমার উৎকণ্ঠিত মনের মধ্যে তোল পাড় করে উঠল, তাই যেন হয়, মুক্ত বিহঙ্গী যেন ঐ ধনীর দুলালের সাথে না যায়। বংশ মর্যাদার ছুরিতে তাহলে তাকে আর প্রাণ দিতে হবে না।

www.pathagar.com

সারাটা রাত্রি ধরে গুলী চল্‌ছে থেমে থেমে। দুপক্ষ এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এসে। সকাল থেকে একটানা বম্বিং হয়েছে সন্ধ্যা অবধি। বম্বিং-এর বিরতির পর সারারাত ধরে এই দ্রুম দ্রুম আওয়াজ চলছে থেমে থেমে। আকাশে বাতাসে যুদ্ধের ভয়াবহতা এখন থম থম করছে।

আগের রাতেও দুটো চোখের পাতা এক করতে পারেনি লালু। গতকাল সকালে এখানে এসেই চোখে পড়ে এক বিপন্ন দৃশ্য। ঝড়ের নিদারুণ পূর্বাভাস। মফস্বলে যা দেখে এসেছে, এখন শহরেও তাই। ওর ধারনা ছিল, শহরটা অন্তত সুরক্ষিত থাকবে। মফস্বলের বড়-ছোট সমস্ত ঘাঁটিই এখন ছত্রখান। লালুর সঙ্গী-সাথীরাও অনেকে ধরা পড়েছে। কারুর প্রাণও গেছে। লালু অবশ্যি বেঁচে আছে এখনও। বেঁচে আছে বলেই তো বাঁচার আকাঙ্খাটা প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে।

সদরের এই ঘাঁটির ওপর থেকে ভর্‌সাটা এখন নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। গাছ উপড়ে গেলে পাতা আর কদিন সবুজ থাকবে। দুপুরের দিকে দারুণ গোলা-গুলীর মুখে যখন পাক সৈন্যের বিরাট বাহিনী সীমান্ত থেকে সরে এলো, তখনই একবার ধ্বক্ করে উঠল লালুর বুকের ভেতর। হোক না রাজাকার, এমনি অবস্থায় বুকটা একবার না কেঁপে কি পারে?

দিনটা শুক্রবার। জুমার নামাজ পড়বে বলে লালু বেরিয়ে পড়েছে শহর থেকে। কিন্তু সারা শহরে জুমা অনুষ্ঠানের কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না তার। বোমার ভয়ে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে করতে নামাজই ভুলেছে গোটা শহরের মানুষ। বড় বড় মসজিদগুলিও আজ বিরাণ। শহরের কাক-পক্ষী উধাও। শুক্রবার হওয়াতে লালুর বড়্‌ডো সুবিধা হয়েছে। নইলে বেরোনো দায় হয়ে পড়ত। মুশকিল কি, শহর থেকে বেরুতে দিচ্ছে না বিহারীরা। হাতে ব্যাগ-বোচ্‌কা নিয়ে বেরোতে গেলে, বন্দুক কাঁধে বিহারীরা বলছে, কঁহা ভাগ্‌তা? ঘুমো ইধার। ব্যস্, বন্দুকের নলের মুখেই ঘুরতে হচ্ছে পলায়নপর মানুষকে। এখন বাঁচার জন্যে মরতে রাজী হওয়া ছাড়া উপায় নাই। লালুকেও বার দুই ফিরতে হয়েছে। কাঁধে কারুর ব্যাগ দেখলেই বিহারীদের আক্ষেপটা চেতে উঠছে। বাঙ্গালীরা বিলকুল ভাগ্‌লে ওদের একলা পেয়ে লাল পিঁপড়ের মত ডলবে মুক্তিরা। বাঙ্গালীদের সাথে মিলে মিশে থাকলে বাঁচলেও বাঁচতে পারে। এখন যা কিছু করা হচ্ছে, তা সব ঐ বাঁচার তাগিদেই। লালুও শেষমেশ কাঁধের ব্যাগ ছেড়েছে। কারণ, ওটাই এখন তার পথের কাঁটা। খালি হাতে জুমা পড়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে একেবারে মজমপুর।

ওর গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, পরনে লুঙ্গী। মজমপুর পার হয়ে বেশখানিক পশ্চিমে গেলে সামনে পড়ে একটা মজা নালা। নালার ওপর গোটা দুই খেজুর গাছ পোতে রাখা হয়েছে এপার-ওপার সাঁকোর মত। সেখানে পৌঁছুতেই বন্দুকধারী একজন পাক সেনার

www.pathagar.com

মুখোমুখি পড়ে গেল লালু। আর ঠিক এমনি মুহূর্তে কুড় কুড় করে একটা ভারতীয় বোমারু এসে হাজির। ছোঁ মেরে বোমা ফেলল কোথাও আশে পাশেই। দুম্ করে একটা শব্দ হল। মাটিও কাঁপল থর থর করে। তবে ফাটল না বোমাটি। বোমা ফাটার আওয়াজ এটা নয়। মাটি থল থলে নরম। পড়েই ডুবে গেছে মাটির তলে। বড়্ডো বাঁচোয়া।

পাক সেনাটি ওকে দেখে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। কাঁধ থেকে বন্দুকটাও খুলতো হয়তো কিন্তু চোখ পড়েছে ওর ফুরফুরে দাড়ির ওপর। একটা চাপা চীৎকার করে আস্তিন গুটায় ব্যাটা। দাঁত খিঁচিয়ে বলে, কিয়া চীজ বানায়া আল্লা মিয়া। ভাগো জলদি করকে।

শুনেই গুটি শুটি ভাগে লালু। খালটা কোন মতে পড়িমরি করে পার হলে সামনে একটি বাড়ি। চৌকস উঠোনের দুপাশে দুটো বড় বড় চৌচালা ঘর। বাড়িতে জোয়ান মরদ কেউ নেই। দুজন বুড়োবুড়ি পাহারা দিচ্ছে। বুড়োবুড়ি এমনিই বা বাঁচবে কদিন? তাই ওদের পাহারায় রেখে ভেগেছে বাড়ি শুদ্ধ নওজোয়ানেরা।

লালু বোমার ভয়ে উঠল গিয়ে বাড়িটায়। পূবের ভিটের ঘরটার উত্তর ঘেঁষে প্রকান্ড একটা ট্রেঞ্চ, এল্প্যটার্নের। ট্রেঞ্চ। যারা কেটেছে, চরম মুহূর্তে ওটার ওপর তারা আর ভরসা রাখতে পারেনি। প্রাণভয়ে পালিয়েছে কোথায়। ওদের ফেলে যাওয়া ঐ গর্তটি দেখে বুকে বল এলো লালুর।

লালুকে গুটি শুটি আসতে দেখে বুড়ো বুড়ি কুৎ কুৎ করে তাকাতে লাগল। তবে ঠাঁই বসে রইল তারা। দুর্যোগের ঝাপটায় একেবারে পাথর হয়ে গেছে। উঠোনে দাঁড়াতেই একখানি বোমারু বিমান কুড় কুড় করে উঠল। তা দেখে লালু এক লাফে বারান্দায়। কিন্তু মুহূর্তেই নিরাপত্তার কথা ভেবে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ল ট্রেঞ্চে। সাথে সাথে আবার দ্রুম।

ট্রেঞ্চে বসে নিদারুণ একটা দুর্গন্ধ এসে ঢুকল নাকে। পেচ্ছাবের গন্ধ। অন্য সময় হলে লালুকে লাখ টাকা দিয়ে কে নামায়? অথচ সেই নিরতিশয় দুর্গন্ধের মধ্যেও সেখানে ঠাঁই বসে রইল সে। সন্ধ্যের আগে অবশ্যি বার দুই বেরিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। এক বার মিনিট পাঁচেক আর একবার মিনিট দশেকের জন্যে নামাজ পড়তে। মাগরেবের অল্পক্ষণ আগে বিমান হামলা থামলে বাইরে এলো সে। এসে দেখে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে হাস্নাবাদের বি,ডি, মেম্বর মোফাজ্জল মিয়া। লম্বা চওড়া কালো মানুষটি বোমার ভয়ে আধসি হয়ে গেছে। শুধু বোমার ভয় নয়, সে একজন মৌলিক গণতন্ত্রী, বোমা পড়ার বিরতির সাথে সাথে তার ওপর মুক্তিদের হাতুড়ী পড়া শুরু হবে বিরামহীন, সেই ভাবনাতেই এখন সে কাঠ হয়ে গেছে। পরিচিত দুটি মানুষের দেখা হল বটে, কিন্তু এ মুহূর্তে দু'জনেই নির্বাক।

বিমান হামলার বিরতি দেখে বুড়োবুড়ি দুজন কিছুটা আশ্বস্ত হল। তাদের আশ্বস্ত

www.pathagar.com

হওয়া সহজ, কারণ বর্তমানটা তাদের ভয়ের, ভবিষ্যৎটা নয়। কিন্তু লালুদের অশ্বস্তিটা অন্য রকম। বিমান হামলার সময় মনোযোগ ছিল সেদিকে কিন্তু বিরতির পর তার বারে বারে মনে হতে লাগল, সে একজন রাজাকার। তার সামনের সীমাহীন অন্ধকারটা এখন গ্রাস করতে আসছে তাকে।

মোফাজ্জল মিয়ার অবস্থাটা আরো একটু ভিন্ন ধরণের। তাই তার মুখখানি একেবারে আমসি। সে প্রাক্তন বি,ডি মেম্বর। কস্মিনকালেও তার মনে হয়নি দুর্ধর্ষ পাক সেনা বাংলার মুক্তিদের হাতে নিস্তনাবুদ হয়ে বাক্সোয় ঢুকে পড়বে। এটা আগে জানতে পারলে সে গলা ফাঁটিয়ে 'জয় বাংলা' ই বলত। যাতে লাভের সম্ভাবনা, সেটা হাত ছাড়া করার অভ্যাসটা তার কোনদিনই তো ছিল না। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' টাও তো সে হিসেব করেই বলত এতকাল। কে জানে, সেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তার সব আশার গুড়ে বালি ঢেলে দেবে? দুর্ভাগ্য, তাই জিনিসটা সে চুল পরিমাণও আঁচ করতে পারেনি আগে। যখন বুঝতে পারল, তখন আর সময় নেই। লক্ষ বার গলা ফাঁটিয়ে এখন জয়গান করলেও মুক্তিরা বিশ্বাস করবে না। যে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দকে সামনে রেখে মোফাজ্জল ঐ অপকর্মটি করেছিল, সেই জীবনটিই আজ তার খাৎরার মুখে। ভেবে চিন্তে এখন তার মুখটা ঘনঘন শুকিয়ে যাচ্ছে। সে আমসি মুখেই লালুর কাছে হাত পাতল, বিড়ি আছে নাকি? বিড়ি?

লালু বিড়ি সিগারেটের ধার ধারে না। বলল, না ভাই, বিড়ি টিড়ি নাই, ওসব আমি খাই না।

—ধ্যূর শালার কপাল! মোফাজ্জল কপালেই একবার হাত মারল দুঃখে। আগে খুব এই কপালেরই তারিফ করত। ইলেকশনে সেবার যখন জিতে গেল, তখন এই কপালের কথা বার বার বলে আনন্দ প্রকাশ করেছে মোফাজ্জল। ভোটারদের হাজার পাঁচেক বিড়ি আর পাঁচশো টাকার চা খাইয়ে নির্বাচনী সাগরে পাল উড়িয়ে দিয়ে পার হয়েছিল, সে তো এই কপাল গুণেই। ফাঁকি ভোট কাস্ট করেই হোক আর যা করেই হোক, বি,ডি, মেম্বর হয়ে দুটো পয়সা আর সম্মান তো পেয়েছিল এই কপালেরই জোরে। এখন সেই কপালই 'ধ্যূর শালার' হয়ে গেল!

লোকটার বিড়ির নেশায় মাথার ভেতর চন চন করছে। চোখগুলি করছে কুঁই কুঁই। সে চোখ মেঝের চারদিকে চৌকির তলে পর্যন্ত ঘুর ঘুর করল বার কয়েক। অনেক সময় উচ্ছিষ্ট আধ্লা বিড়ি পড়ে টড়ে থাকে মেঝের ওপর কিংবা চৌকির তলে। নাহ্, কিচ্ছু নেই। মোফাজ্জলের ভুল ভাঙ্গলে বুঝল এটা তার স্বগৃহ নয়। সেখানে অবশ্যি দু একটা আধ্লা টাধ্লা না পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু সেই বাড়িটাই যে এখন মুক্তিদের দখলে।

সাঁঝের আকাশে ঘোর লাগতেই ওর নেশার ঘোরটাও প্রবল হয়ে উঠল। বিড়ির

www.pathagar.com

তালাশে লালুকে সে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো একটা কাঠের আড়তে। লম্বা-দৌড়তি ঘর। সে ঘরে বিরাট উটের মতন গলাঅলা একটা করাত কল কর্মহীন পড়ে। চার পাশে ছড়ানো ছিটানো মোটা কাঠের গুঁড়ি। আর গোটা এলাকায় বিচরণশীল মানুষ মাত্র একটি। মনিবের কারখানায় সে পাহারা দিচ্ছে আপন প্রাণটা হাতের মুঠোয় নিয়ে।

লোকটাকে দেখে মোফাজ্জল আম্‌সি মুখেই হাসল একটু। তারপর বলল, একটা বিড়ি হবে, ভাই?

—বিড়ি? পকেট হাতড়াতে লাগল লোকটি। -উঁহু, বিড়ি তো নেই, ভাইজান। পকেটে হাত ভরার সময় মোফাজ্জলের চোখ দুটি যেমন সহসা জ্বলে উঠেছিল, তেমনি সহসাই নিভে গেল দপ্ করে,-অ্যাই!

আপন মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয় মোফাজ্জলের একটা বিড়ির অভাব তাকে পাগল করে তুলেছে। তার হা-হুতাশ দেখে করাত কলের লোকটি বলল, দাঁড়ান দেখি। বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে নিয়ে এলো সাদা ধব ধবে একটা আস্ত সিগারেট-শলাকা। এই আতিথেয়তার অনুপম আনন্দে মোফাজ্জলের চোখ দুটি একেবারে বুঁজে এলো।

ঘনান্ধকার রাত্রি ঠিক সময় মতই এসে গেল। তার সময়ের একচুল হের ফের হয় না। আঁধারের প্রকান্ড কালো ডানা মেলে সে কাঁটায় কাঁটায় এসে দুনিয়াটা ছেয়ে ফেলেছে। নিথর মৌনতায় চারিদিক নিঝুম। ঝিঁঝিঁরাও ডাক ভুলে হতবাক হয়ে গেছে। করাত কলের লোকটা মস্ত একটা কাঁথা এনে নীচে কাঠের ভূষি বিছিয়ে গদীর মতন করে বিছানা পেতে দিল দুজন মেহমানকে। শোবার বন্দোবস্ত তোফা হল বটে কিন্তু খাবার বন্দোবস্ত হল যৎ সামান্য। একজনের খাবার মত ভাত, অল্প একটু গোল আলুর ভর্তা আর সামান্য ডাল। ঐ অন্ন-ব্যঞ্জন দিয়েই তিনজনের উদর পূর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। করাত কলের লোকটার সনির্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে কুপীর আলোতে বসে মেহমানদের গিলতেই হল কয়েক লোকমা ঠান্ডা কড়কড়ে ভাত। খাবার দাবার সাঙ্গ হলে মোফাজ্জল তার নেবানো আধ্‌লা সিগারেটে আগুন ধরাতে যাবে ঠিক এমনি সময় আবার হঠাৎ শব্দ হল, দুম্। একটা মর্টারের শেল দক্ষিণের রণাঙ্গন থেকে উড়ে এসে করাত কলের টিনশেড পার হয়ে চলে গেল সোজা উত্তরে।

করাত কলের লোকটা শুয়েছিল নিকটেই ভিন্ন বিছানায়। পাশ ফিরে একটা হাই তুলে বলল, মুক্তিরা এসে গেছে বিত্তি পাড়ায়।

ওর নির্লিপ্ত কথাটি আস্ত একটা শেলের মত লাগল গিয়ে মোফাজ্জলের কলিজায়। প্রতিবাদের প্রবল বাসনা জাগল তার। বলল, ঐ পর্যন্তই, আর হচ্ছে না, শহরে মিলিটারীদের ঘাঁটি বড় মজবুত।

www.pathagar.com

করাত কলের লোকটা নিশ্চুপ হয়ে গেল। ওদের এগোনো পিছোনোতে তার বড় একটা যায় আসে না। যে পারে সে এগোক, আর যে না পারে সে পিছোক। তার জন্যে লোকটির মাথা ব্যথা নেই। তাই সে আবার আর একটি নির্লিপ্ততার হাই তুলে পাশ ফিরল।

লালু এসব কথায় বড় একটা কান দিতে পারছে না। মনটা তার এখন লাভালাভের হিসাব নিয়ে মগ্ন। ভারত বিভাগের সময় লালু সাত আট বছরের বালক। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' শ্লোগান দিয়ে সদর রাস্তা ধরে যে মিছিল আসতো, সেও ঢুকে পড়ত ঐ মিছিলে। শ্লোগানের মানে কিইবা বুঝতো সে। তবে এ টুকু মনে পড়ে ঐ শ্লোগান নিয়ে দ্বিজপদ বিশ্বাসের সংগে টক্কর লেগেছিল লালুর বাপ দীন মহম্মদের। তার কিছুদিন পরেই ইংরেজী আটচল্লিশের এক কালো রাতে দীন মহম্মদ গুম হয়ে গেলেন। আর কেউ খোঁজ পেল না তাঁর। ভীতি-বিহবল মায়ের হাত ধরে এক তয়াল রাতে বর্ডার পার হয়ে লালু উঠে এসেছিল পাকিস্তানে। সেদিনের মর্মন্তুদ ঘটনা ওর মনে এখনও জ্বলজ্বল করে ভাসে। মার সাথে প্রসঙ্গ উঠলেই মা চোখের পানি ঢেলে বলতেন, তেলে জলে এক হয় না রে লালু। তোর বাপ জল হয়ে ওদের সাথে মিশতে পারেনি বলেই তো ওরা তাকে মেরে ফেলল। তোর অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে ওদের সাথে মিশতে যা, দেখবি, ওরা তোকে জামাই আদর করবে। আর যদি আপন দ্বীন-ধর্মের ওপর দাঁড়াতে চাস, দেখবি তখন ঐ বন্ধুরাই সব শত্রু হয়ে গেছে।

লালুর মনে এই ভাবনার বুনিয়াদটা মা-ই গেড়েছিলেন শিশুকালে। মাকে লালু শ্রদ্ধা করতো, ভালবাসতো। লালুর নানা ছিলেন জবরদস্ত আলেম। কেন যে আলেমদের মধ্যে এই ভাবনাটা এমন তীব্র ছিল, সেই অল্প বয়সে ওর মাথায় ঢোকেনি জিনিসটা। সেই ভাবনার সূত্র ধরে অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে পাকিস্তান প্রীতির মত বিপজ্জনক খেয়ালটা লালুর মগজে পাথর হয়ে বসে গিয়েছিল। পাকিস্তান প্রীতি থাকলেও পাকিস্তানের নেতাদের প্রতি তার ছিল প্রবল বীতশ্রদ্ধা। এই ঘৃণাটা জন্মে ছিল দেশের দুই অংশের নিদারুণ বৈষম্য দেখে। এটা তাকে দারুণ অস্থির করেও তুলতো মাঝে মাঝে। একবার তো ক্ষুব্ধ লালু এ নিয়ে ছুটে গিয়েছিল নেতার কাছে। বৈষম্যের ব্যাপারে উত্তর একটা তার চাই-ই চাই।

লালুর নেতা জবাব দিয়েছিলেন, বৈষম্যের কারণ পাকিস্তান নয়, পাকিস্তানের কর্মকর্তারা ওঁদের আপন কৃতকর্মের জন্যে আল্লার দরবারে জবাবদিহির ভয় নেই। যার জবাবদিহির ভয় নেই, সে নির্দ্বিধায় অন্যের ক্ষতি করতে পারে।

হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। তাহলে ঐ নেতাদের খপ্পর থেকে এ দেশের লোক বেরিয়ে আসবে না কেন? দেশটাকে স্বাধীন করবে না কেন? স্বাধীন হলে ক্ষতিটা কি?

নেতা জবাবে বলেছিলেন, কোন ক্ষতি নেই।

www.pathagar.com

—তাহলে স্বাধীনতার যুদ্ধে আমরা অংশগ্রহণ করছি না কেন?

জবাবে লালুর নেতা বলেছিলেন, সে রকম যুদ্ধ হলে তো আমরা হতাম প্রথম কাতারের প্রথম মানুষ। কিন্তু আমাদের ভয় হচ্ছে....

লালু প্রশ্ন করেছিল, কি ভয়?

—ভয় হচ্ছে, আমরা পাঁচ কোটির হাতের মধ্য থেকে বেরিয়ে পঞ্চাশ কোটির পায়ের তলে চলে যাচ্ছি। ইতিহাস সাক্ষী, এই পঞ্চাশ কোটি মানুষ কোনদিন আমাদের বন্ধু হতে পারেনি।

সেদিন লালুর কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল। একটা ভিন্ন বুঝ ওর মগজে আশ্রয় লাভ করেছিল। নেতা নিজের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে তাঁর আদর্শে কায়েম ছিলেন, নেতার মৃত্যুর পরে এই কথাটি জানা গিয়েছিল।

সেই আদর্শবাদী মানুষটা লালুর মৃত্যু ভয়টাকেও ভুলিয়ে দিয়েছিল। অদ্ভুত!

রাত্রিভর এক একটা মর্টারের শব্দ অকস্মাৎ লালুকে চমকে দিচ্ছে। কিন্তু চিন্তার ধারাবাহিকতা চলেছে বিরামহীন। সেদিনের কথা মনে পড়ে। দেয়ালে একটা বড় সড়ো পোস্টার ঝকমক করছে। "সোনার বাংলা শ্মশান কেন?" গোটা দেশের মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল ঐ একখানি পোস্টার। কিন্তু লালু বাঙ্গালী হয়েও সেদিন ঐ পোস্টারের অর্থ বুঝতে পারেনি। তার মাথায় তখন নেতার সেই কথা, নেতাদের কৃতকর্মের জন্যে আল্লার কাছে জবাবদিহির ভয় থাকতে হবে। লালুর বারবার প্রশ্ন জেগেছিল, দেশের যারা নতুন কর্ণধার হতে যাচ্ছেন, তাদের সেটা আছে তো? নেতাদের গোটা আমলে ঐ জবাবদিহির অনুভূতি আছে এ প্রমাণ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বার করতে পারেনি লালু। ওঁদের আমল-আখলাকে নিরাশ হয়েই অত বড় দল ত্যাগ করে ছোট্ট একটা দলের কর্মী হয়েছিল লালু।

এই চিন্তা যখন ওর প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয়, তখনই সে দেশ রক্ষার নামে অস্ত্র তুলে নেয় হাতে। দেশ তো এই বাংলাদেশই। পার্থক্য শুধু এতটুকু হচ্ছে যে, এই দেশ থেকে আল্লার কাছে জবাবদিহির অনুভূতিহীন এক সরকারকে উৎখাত করে অনুরূপই আর একটি সরকার কায়েম করা হচ্ছে। সেই ইংরেজী প্রবাদটায় যেমন বলা হয়েছে, ওল্ড্ ওয়াইন ইন দি নিউ বটল। লালুর ধারণা হয়েছিল, এই উদীয়মান ভদ্রলোকেরাও একদিন ডুববে, আর গোটা জাতিকেও ডোবাবে। তাই তো বিভ্রান্তির নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কেউ কারুর মুখ দেখতে না পেয়ে ভ্রাতৃঘাতি সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু কেন এমনটা হল?

বারবার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে লালুর। চিন্তার প্রবাহটি মুহূর্মুহু দিক পাল্টাচ্ছে। লালুর

www.pathagar.com

আপন ভাই আর ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। থাকে ভারতের করিমপুরে। ভ্রাতুষ্পুত্র আনিসুর রহমান খবর পাঠিয়েছে, চাচা যেন তাঁর অন্যায় ভূমিকা ত্যাগ করে মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায় মুক্তিযোদ্ধা মুসলমানদের আপন সন্তানের মত স্নেহ করেন, তাদের প্রতিটি কাজে দারুণ উৎসাহ দান করেন। লালুর কঠিন মন এ কথায় গলতে চায়নি। বরং সে স্বগত প্রশ্ন করেছে, ওরা সত্যি তোকে ভালবাসে, আনিস? সত্যি কথা? কিন্তু তাহলে তোর দাদা দীন মহম্মদকে ওরা ভালবাসল না কেন? নারায়ে তকবীর বলে মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে, তাঁকে গুম হতে হল কেন? তাহলে তুই কি সেই নারায়ে তাকবীর ভুলে গিয়েছিস, বাপ্? না হলে এত আদর তো পাবার কথা নয়।

লালুর মনে একটা বিষয়ে দারুণ দৃঢ়তা ছিল। আপন হৃদয়ের গহীন সায়রে ডুবুরী নামিয়ে সে বহু তল্লাশি চালিয়েছে তাই নিয়ে। স্বার্থ বুদ্ধিতে যদি একাজ সে করতো তাহলে তার দুনিয়াবী ভাগ্য অবশ্যিই খুলে যেত। এমনভাবে কপর্দক শূন্য হয়ে পথে নামতে হত না। মোহনলাল আগরওয়ালার আড়তের হাজার হাজার মণ খেসাড়ি-ছোলা যখন লোকে লুটে পুটে নিয়ে গেল, তখন সুযোগ থাকতেও এমন কি টাকা-পয়সা স্বর্ণালংকার পর্যন্ত সে ছোঁয়নি হাত দিয়ে। কিসের জোরে পেরেছে লালু? সে তো তার প্রত্যয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। সে প্রত্যয় তার অন্তরে জবাবদিহির ভয় সৃষ্টি করে দিয়েছে। লালুর হাতদুটিকে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে পেছনে। তার সাথের কোন কোন রাজাকারও তো লোভ সামলাতে পারেনি। কারণ, তাদের অন্তরে কৃতকর্মের জবাবদিহির ভয় ছিল না। মানুষের উন্মাতাল আবেগ দেখে তার মন বারবার সংশয়িত হয়ে প্রশ্ন করেছে, ঐ সরল মানুষেরা যা চায়, তা কি তারা পাবে? সত্যি সত্যি কি তারা টাকায় দুই সের চাল কিনে পেট পুরে খেতে পাবে? দেশের কাগজ ছ আনায় এক দিস্তা কিনতে পারবে? জমির খাজনা কমে যাবে? অফিস আদালতে আর ঘুষ-রিশওয়াত থাকবে না? মানুষে-মানুষে, বাঙ্গালীতে-বাঙ্গালীতে আর হিংসা-দ্বেষ থাকবে না? মানীর মান, নারীর ইজ্জত ভুলুণ্ঠিত হবে না। দেশের বাতাসে দেশীয় কবির জাতীয় সংগীত নিরন্তর ধ্বনিত হবে? এ দায়িত্ব পালনের যোগ্য জাতীয় নেতা আছে কে, যাঁর জবাবদিহির অনুভূতি লক্ষ্য করে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, যিনি জাতিকেও ডোবাবেন না, নিজেও ডুববেন না? কই সে ব্যক্তিত্ব?

দুম্ শোঁ ওঁ ওঁ ওঁ। দক্ষিণের রণাঙ্গন থেকে আর একটা শেল উড়ে গেল উত্তরের দিকে। মুক্তি বাহিনী মজবুত ঘাঁটি গেড়েছে দক্ষিণের প্রশস্ত রাজপথের ধারে ধারে। রাত পোহালেই বাধবে লড়াই। লালু আর মোফাজ্জল ভাগবে তাঁর আগেই। কারুরই কোন গন্তব্য ঠিক নেই। বাংলার মাটি ওদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গেছে এখন।

গাঢ় অন্ধকারের মস্তবড় একটা পাথর লালুর বুকে ঠেসে বসে আছে। ওরা শুয়ে আছে নির্ঘুম। সহসা খুট করে উত্তর পশ্চিমের দরজায় শব্দ উঠল একটা। দেশলাইয়ের

www.pathagar.com

কাঠির মাথায় দপ্ করে জ্বলে উঠল শুভ্র ক্ষীণ আলোর শিখা।

করাত কলের লোকটা হা হা করে উঠল তা দেখে। সাড়া পেয়ে মুহূর্তে দপ্ করেই নিভে গেল শিখাটি। হাট করে খোলা দরজা দিয়ে রাতের অতিথি যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেছে। মোফাজ্জল প্রশ্ন করল, কে ও?

করাত কলের লোকটি জবাব দিল, শালাটা চোর। সাইকেলখান চুরি করতে এসেছিল।

—এই দুর্দিনে চুরি?

—চোরের দুর্দিন নেই।

তখনো ভোর হয়নি। শুনশান উত্তরের বড় সড়কে দ্রুম করে আবার শব্দ উঠল একটা। চায়নীজ রাইফেলের গুলীর শব্দ। খানিকক্ষণ ধরে ফুস্‌স্‌স্ করে বাতাস বেরিয়ে গেল একখানা জীপ গাড়ির টায়ার থেকে। কিছুক্ষণ পর গোঁ গোঁ করতে করতে একটা মোটর গাড়ি শহর থেকে বেরিয়ে চলে গেল উত্তরের সড়ক ধরে। সেই হল শুরু। সারি সারি গাড়ির মিছিল ছুটল এবার। লালু একটু মনোযোগী হয়ে উঠল। বাৎচিৎ শুনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ওরা সেই পলায়নপর মিলিটারী। ভাগছে এখন দলে দলে। আরো একটু উৎকর্ণ হয়ে লালু ওদের তেরিয়া মেরিয়া কথার দুচারটে আওয়াজও শুনতে পায়। মোফাজ্জল ঘুমে, না কাঁপ মেরে পড়ে আছে, সেই জানে। লালু ভাবে একটা ধাক্কা দেবে ওকে। কিন্তু জাগিয়েই বা লাভ কি? জেগেই বা সে করবে কি? জেগেই তো ঐ সিকি পরিমাণ নেভানো সিগারেট টুকু নিয়ে পড়বে ব্যাটা। থাক, মরবার আগে খানিক আরাম করে নিক।

মিলিটারীদের যাত্রা শেষ হলে এবার যাদের শুরু, তারা হল বিহারী। কোথায় পালাচ্ছে ওরা তার হদিস জানা নেই ওদের। খাঁচায় পড়া ইঁদুর যেমন খাঁচার মধ্যে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছোটে, এও ঠিক তেমনি। গোটা শহরের বিহারীরা এবার পিঁপড়ের সারির মতন বেরিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে। প্রথমে বাস, ট্রাক, লরী, সব শেষে পদযাত্রীর মিছিল। শিশুর কান্না ধ্বনি, নারীর হাহাকার সবকিছু মিলে চ্যাঁ চুঁ আর হাউকাউ-এ গোটা রাজপথ স্পন্দিত। শুরু হয়েছে সুবহ কাযিবেরও আগে, কিন্তু এখন সূর্য উঠি উঠি করছে মিছিলের আর শেষ নেই।

মিছিল দেখলে এখন চলবে না। লালুদেরও ভাগতে হবে ওদের মতই। বিহারী আর রাজাকার এক বরাবর। ওদের সাথে একটুখানি পার্থক্য অবশ্যি আছে। সেটা এই যে, বিহারীদের মুখের ভাষা ওদের আত্মরক্ষার পথে প্রবল বাধা। আর লালু নিজেকে পরিচয়হীন করে রাখতে পারলে, ভাষার কারণে তার ধরা পড়বার ভয় নেই। রাজাকার

www.pathagar.com

হলেও তো সে বাঙ্গালী। মরবার আগে ঐ বাঙ্গালীত্বটুকু কাজে লাগাবার চেষ্টা করে দেখবে লালু। তাই সে মিছিলে যাবে না। বিহারীর মিছিলে বাঙ্গালীর শামীল হওয়াও উচিৎ নয়। এখন মুসলমান বলে তো রক্ষা পাবার জো নেই। বিহারীরা মরবে। অবধারিত মরবে। সুতরাং ঐ মিছিলে শামীল হওয়া গুরুতর আহাম্মুকি।

চিন্তা করতে করতেই প্রভাত-আলো বেশ খানিক ফর্সা করে দিল চারদিক। এমনি সময় করাত কলের লোকটি কোথা থেকে এক টিন ময়দা আর আধ টিন ডালডা ঘি নিয়ে হাসি মুখে দাঁড়াল সামনে। মিলিটারী আর বিহারীদের ছুঁড়ে ফেলা মালামালে এখন রাস্তা ভরপুর। যে যত পারে লুটছে সবাই। এখন মেহমানদারীর ব্যাপারে করাত কলের লোকটির আর কোন অসুবিধা নাই।

লালুর মেহমানদারী গ্রহণে আসক্তি নেই। এদিকে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠেছে মোফাজ্জলও। উঠেই পোড়া সিগারেট টুকু হাতে তুলে নিয়েছে ব্যাটা। ওর কান্ড দেখে মনে হয় মরণের ঠিক আগে কেউ যখন ওর সর্বশেষ অভিলাষটি জানতে চাইবে, ও নির্ঘাৎ বলে বসবে, একটা বিড়ি।

গায়ে গেঞ্জির ওপর একটা বিস্কুট রঙের পুলোভার, তার ওপর সাদা পাঞ্জাবী, তার ওপর জড়ানো ছাই রঙের পশমী আলোয়ান। পরনে রুহিতপুরী চেক লুঙ্গি আর পায়ে এক জোড়া পুরোনো রঙচটা কালো পাম্প শু। এই গুলি লালুর পরিধেয়। আর সম্পদের মধ্যে পঁচিশটি টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা। বাঁচার তাগিদে কিছু পয়সা কড়ির দরকার ভেবে হাজী সাহেবের জামাই আজিজুর রহমানের কাছে পঁচিশটি টাকা কর্জ নিয়ে বেরিয়েছে সে। গৃহে কপর্দকও নেই। কর্জ করা ছাড়া উপায় ছিল না লালুর।

এই সজ্জা ও সম্পদ নিয়ে মোফাজ্জলের সাথে সে পথে এসে দাঁড়াল আবার। পথে এসে দুজনের মতবিরোধ হল। লালু বলল, সোজা বড় সড়ক ধরে গেলে পরিচিত জায়গা দিয়ে যেতে হবে। ধরা পড়া অনিবার্য।

মোফাজ্জল প্রতিবাদ করে বলল, মুক্তিরা এখন বিজয় আনন্দে মাতোয়ারা, ওরা আমাদের কিচ্ছু বলবে না। বলেই সে বড় সড়ক ধরে হেঁটে চলে গেল। এখন যত শীঘ্র হয় তার একটা সিগারেট অথবা বিড়ির দরকার। আর এই সড়কের ধারেও কোন গিমটি দোকানে সেটা পাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা তাকে অধীর করে তুলেছে।

অপসৃয়মান ক্ষণিকের সাথীটির দিকে লালু নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল কিছুক্ষন। সোজা পথে মোফাজ্জলের লম্বা দেহটি দূরান্তরে ধীরে ধীরে একটি বিন্দুতে পরিণত হয়ে এক সময় মিলিয়ে গেল। লালু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে জানাপথ ছেড়ে এবার অজানা পথে পা বাড়াল।

ঘুম থেকে জেগেই আশে পাশের লোকেরা যখন হাল হকিকত টের পেয়েছে তখন

www.pathagar.com

দলে দলে পিঁপড়ের সারির মত মিছিল শুরু করেছে শহর অভিমুখে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। পরিত্যক্ত স্বাধীন শহরটা তারা প্রাণ ভরে দেখবে, আর সাথে সাথে পরিত্যক্ত মালামাল কোঁচড় ভর্তি করে ঘরে আনবে। একজন উঠতি বয়সের ছোকরা ঊর্ধশ্বাসে ছুটছে শহরে। তার নাকি কোন কিছুর দরকার নাই, দরকার শুধুমাত্র একখানা রাইফেলের। সেটা কব্জা করতে পারলে সব কিছুই সে হাসিল করতে পারবে। কথাটা কানে যেতেই লালু শিউরে উঠল একবার। হয়ত ছোকরা শহরে গিয়ে পেয়েও যেতে পারে তার ইপ্সিত বস্তুটি। তারপর....

লালু এখন জনস্রোতের বিপরীত পথে হাঁটছে একলা। তার আচরণটা মানুষের মনে কোন রকম ধারণা সৃষ্টি করলেই মুশকিল। তখন? কিন্তু বাঁচোয়াটা এই যে, এই উল্লসিত জনতা এখন আপন চিন্তায় এমনি বিভোর যে অন্যের কথা ভাববারও অবসর নেই তাদের।

ডিসেম্বরের সকাল। প্রচন্ড শীত পড়েছে কিন্তু শীতের হুঁশ নেই লালুর। হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পৌঁছল নদীর কিনারে। সামনে একটা টং দোকান। তারই পাশ দিয়ে একটি পথ নেমে গেছে নদীতে। ডিসেম্বরের নদী এখন শুকিয়ে গেছে। তলায় নেমে গেছে পানি। এপারে উঁচু পাড়। ওপারে সীমাহীন বালিয়াড়ি। দ্বিধান্বিত লালু এইখানে দাঁড়াল দুমুহূর্ত। পকেটের খুচরো পয়সা থেকে দশ পয়সার বিস্কুট কিনে নিল। পানির পিপাসা হয়েছে দারুণ। ঐ বিস্কুট চিবিয়ে একটু পানি খাবে সে।

দেখতে দেখতে একখানি ডিঙ্গি এসে ভিড়ল কিনারে। শীতের শীর্ণ নদীতে শান্ত নিস্তরঙ্গ পানি। এপারে উঁচু পাড়ে সমাকীর্ণ সবুজ বনরাজি। ভাঙ্গনের তীরে দাঁড়িয়ে আছে তাল-তমাল আর লতা-গুল্ম শোভিত সুনিবিড় এই অরণ্যানী। ঢালু পথটি একটু বাঁক নিয়ে নেমে গেছে একেবারে পানির কিনারে। ওপারের দুস্তর বালুতট ধীরে ধীরে মিশে গেছে নিঃসীম দিগন্তে। শান্ত নদীর পানির ওপর ধোঁয়ার কুন্ডলীর মত নেচে বেড়াচ্ছে শীতের কুয়াশা।

লালুর সামনে এখন দুটি পথ। একটা জানা, অন্যটা অজানা। একটা চলে গেছে তার পরিচিত কর্মস্থলে, আর অন্যটা চলে গেছে ওর অপরিচিত অনুমানের দিকে। কোন দিকে যাবে তাই নিয়ে দ্বিধায় পড়েছিল লালু। কিন্তু সেই দ্বিধার ছেদ পড়ল মাঝির ডাকে, আসেন সায়েব! নৌকা ছেড়ে দিব।

লালু যেন দিশেহারা মুহূর্তে দিশেটা সহসাই পেয়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে সে উঠল নৌকায়। মাঝি শুদ্ধ জন পাঁচেক যাত্রী। নৌকার যাত্রীরা সবাই সমস্বরে রাজাকারদের চৌদ্দ গুষ্ঠীর নিকুচিতে সরব। লালু একখানা বিস্কুট মুখে দিয়ে চিবুতে গেল। বিস্কুট চিবোনো গেল না। মুখে একদম লালা সরে না। এক আঁজলা পানি নদী থেকে তুলে মুখে দিল। গলায় নামতে চায় না সে পানি।

www.pathagar.com

অন্য কূলে নৌকা ভিড়লে এপারের গ্রাম গুলির পরিচয় নিল লালু। ঐ টে আদাপুর, ঐ টে ঝিলকাতরা, চরকাদা। ঐ দূরে জিলা শহর, তীরে উঠলে ভাসা ভাসা দেখা যাবে।

মাঝিকে শুধাল লালু, পথ কই?

মাঝি জবাবে বলল, তেমন পথ নেই, দেখে শুনে যেতে হবে।

নদী থেকে সোজা তীরে উঠে গেল লালু। কুয়াশার আবছা ঘোর কাটিয়ে সূর্য ততক্ষণে বেশ খানিক উপরে উঠে গেছে। বালিয়াড়িটা কুয়াশা মুক্ত হবার পর হলুদ রোদে ঝলমল করছে। এই নিঃসীম বালুর প্রান্তরে জনমানবের কোন চিহ্ন চোখে পড়েনা লালুর। তবু অচেনা অজানা পথে নিঃসঙ্গভাবেই সে চলতে থাকে। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে সামনে আর একটা উঁচু পাড় চোখে পড়ল। উপরে মাষকলাই-এর ক্ষেত। বেশ খানিক দূরে একটি গ্রাম। মাষকলাই-এর ক্ষেতে অদ্ভুত একটা কাঁচা কাঁচা ঘাসী গন্ধ ছুটেছে। এ গন্ধ তার খুবই পরিচিত। লালু তন্ময় হয়ে কিছুক্ষণ মেঠোপথ ধরে চলতে থাকে। বেশ খানিক পথ চলার পর হঠাৎ সে দুজন যুবককে দেখতে পেল। ওদের পরনে লুঙ্গি, গায়ে সুতীর চাদর। আর দুজনের কাঁধেই একটি করে থ্রি নট থ্রি। লালুর স্থির বিশ্বাস ওরা মুক্তি না হয়ে পারে না। প্রথমে কী করবে ভেবে স্থির করতে না পেরে একচোট হকচকিয়ে পালাতে চেয়েছিল পাশ কেটে। কিন্তু কাজটি যে সহজ নয় সেটা সে চট্ করে আঁচ করে ফেলল। তারপর ধাঁ করে ছুট দিল ঐ মুক্তিদের দিকেই। সামনে গিয়ে বলল, আর চিন্তার কারণ নেই, ভাই! শহর এখন মুক্ত। আজ রাত্তিরে পাক সেনারা বিলকুল ভেগেছে শহর থেকে।

বিস্ময়কর ফল দেখে লালু নিজেই অবাক হয়ে গেল। ওরা জিজ্ঞাসাবাদ করবে কি? মুহূর্তে বড়ই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল। আনন্দে উল্লসিত হয়ে লালুকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন আপনি?

—রাজশাহী, আমার ভাগ্নের কাছে যাব।

ওদের একজন বলল, ঐ যে বাড়িটা দেখছেন, করোগেট টিনের বড় বড় ঘর, ঐটে আমাদের কমান্ডারের বাড়ি। যান, ওখানে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নিয়ে তবে যাবেন। ওখানে সংবাদটাও জানাবেন। বলে ওরা ফূর্তিতে নাচতে নাচতে মেঠো নদীর ঢালুতে নেমে অদৃশ্য হয়ে চলে গেল।

লালু অবশ্যি যাচ্ছিল ঐ দিকেই। খবরটা পেয়ে বুদ্ধি করে পথটা ছাড়ল সে। একেবারে বাঘের মুখে ঢুকে পড়ার সাধ মোটেই নেই তার। কমান্ডারের বাড়ি বেশ খানিক বামে রেখে এবার হাঁটতে লাগল সোজা ডান দিকের পথ ধরে।

সামনে উৎসুক মানুষের জটলা। ঠাঁই দাঁড়িয়ে শহরের বুকে বোমা পড়ার দৃশ্য

www.pathagar.com

দেখছে ওরা। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী মেঘের মত গবগব করে উঠে যাচ্ছে আকাশে। দেখবার জিনিস বটে।

জটলার পাশ দিয়ে চলতে গিয়ে তার নবাবিষ্কৃত দাওয়াইটি আবার প্রয়োগ করল লালু। ফল তেমনি বিস্ময়কর।

একজন প্রশ্ন করল, তাহলে এখনও বোমা পড়ছে কেন?

লালু জবাব দিল, পাক সেনারা রাতেই ভেগেছে। ভারতীয় বিমান এখন আন্দাজেই বোমা ঢালছে। ওরা হয়ত খবরই পায়নি।

দুচারজন লোক গভীর আগ্রহ ভরে ধীরে ধীরে লালুর মুখের কথাটি শুনতে চাইল; লালু বলল, না ভাই। এখন আমার দেরী করার সময় হবে না।

একজন লোক কিছুতেই তাকে ছাড়ল না। জোর করে তার হাত ধরে নিয়ে বসাল দহলিজে। দ্রুত স্বাধীনতা ঘনিয়ে আসছে শুনে আনন্দে তার চোখ দুটি চকচকে হয়ে উঠেছে। বলল, বসুন ভাই। আপনাকে খালি মুখে কিছুতেই যেতে দেব না। বলেই কিছু কালচে গুড়, খান দুই শুকনো রুটি আর ঝকমকে মাজাঘষা কাঁসার এক বাটি পানি এনে সামনে রাখল। তারপর বলল, আমাদের ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে জেনে আমাদের খাদ্য শস্য বন্ধ করে দিয়েছে খান সেনারা। বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিয়েছে।

লালু চেয়ে দেখল, পাড়াকে পাড়া শুধু খুঁটির পোড়া বাঁশগুলি দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছু নাই। ফেৎনার আগুনে সব দগ্ধ করে সেরেছে।

লোকটি বলল, এই পাড়াটা কোনমতে বেঁচে গেছে। আর সব শেষ। যাক দেশ তো স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের এই দুর্দিন থাকবে না। আমরা সেই সুদিনের আশায় আমাদের এই বিপুল ক্ষতি হাসি মুখে সহ্য করছি।

লালুর বুকটায় দারুণ মোচড় দিল এবার। তার বিপরীত প্রত্যয়টা একবার তাকে ক্ষত বিক্ষত করতে চাইল। জবাবদিহির অনুভূতিহীন এই নেতারা এই সরল প্রাণ মানুষগুলির মুখে কি কোন দিন হাসি ফোটাতে পারবে? লালু তার ভাবনাটাকে পর্যুদস্ত করে মনে মনে একবার দোয়া করল, আল্লাহ এই ব্যথাতুর মানুষগুলির মুখে তুমি হাসি ফোটাও। ভাবতে ভাবতে লালুর চোখ দুটিও সহসা অশ্রু সজল হয়ে উঠল।

লালুর চোখে পানি দেখে লোকটি গদ গদ কণ্ঠে বলল, আর দু-এক দিনেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। তখন সে স্বাধীনতার স্বাদ আমাদের সবার ঘরে ঘরে পৌঁছুবে। আমাদের দুঃখ ঘুচবে, সবার মুখে হাসি ফুটবে। লোকটির নিজের চোখেও তখন আবেগে অশ্রু দেখা দিয়েছে।

লালু মনে মনে বার বার বলতে লাগল, তাই হোক, তাই হোক। আল্লাহ তাই

www.pathagar.com

করুন।

স্বাধীনতার সংবাদবাহী লালুকে ঘিরে একটা আনন্দ মঞ্চ গড়ে তুলল ওরা। স্বাধীনতার সংবাদে সবার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মুখ মুছে লালু বলল, আমি তো পথ চিনি না, কেউ একজন এগিয়ে দিলে ভাল হত।

একজন লোক একটি কালো মত পনের ষোল বছরের ছোকরাকে দেখিয়ে বলল, ঐ যে ঐ ছোঁড়াকে নিয়ে যান, ওকে একটা টাকা দিয়ে দিবেন।

পথে নেমে কাঁধের আলোয়ানখানা একবার ছেলেটির হাতে দিতে চাইল লালু। পরক্ষণে ভাবল সামান্য জিনিসটি সে নিজেই বহন করবে। একে দিয়ে কাজ নেই।

ক্যানেলের পাড় দিয়ে উঁচু রাস্তা। দুধারে পোড়া বাড়িঘর। তা দেখে লালু ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, এসব কে পোড়াল, খান সেনারা?

—না, সায়েব, নকসালীরা।

লালু অবাক কণ্ঠে শুধাল, তারা পোড়াল কেন?

—এ অঞ্চলের নক্সালীরা খান সেনাদের সাথে যোগ দিয়েছে।

—বটে?

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ।

লালু এবার ছেলেটির নিজের ব্যাপারে প্রশ্ন করল, তুমি কী কর?

কী করব, সায়েব। এতদিন হিন্দুস্তানে ছিলাম, এক হপ্তাহ আগে এসেছি।

—হিন্দুস্তানে কোথায় ছিলে?

—ফুনকির বটতলা আছে না? সেখানেই ছিলাম।

—চলে এলে কেন?

ছেলেটি নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দিল, এমনি।

—এমনি চলে এলে, হিন্দুস্তানের লোকেরা দেখতে পারত না নাকি তোমাদের?

এবার ছেলেটি অবাক কণ্ঠে বলল, কী বলেন সায়েব। দেখতে পারত না মানে? হিন্দুরা আমাদের দারুণ আদর করত সায়েব। তবে ওখানকার মুসলমানরা একেবারে দুচক্ষে দেখতে পারত না। কুকুরের মতন দূর দূর করত। বলত, গাদ্দাররা ভাগ এখান থেকে। আমার এক খালু আছে। সেই ব্যাটা পাঁজির হাড্ডি। সেই চোট্টাব্যাটাই তো

www.pathagar.com

আমাকে তাড়িয়ে দিল।

—আর তুমি চলে এলে?

—না এসে আর কী করব? কথাটা হিন্দুদের জানালে ব্যাটাকে ঠেঙ্গিয়ে লম্বা করে ছাড়ত। বলিনি, আমার খালা কাঁদবে ভেবে।

মাইল খানেক পথ আসার পর ছেলেটি এবার বেঁকে বসল। আর যেতে পারব না, সায়েব। ফিরতে দেরী হলে নক্সালীরা গলা কেটে মেরে ফেলবে।

গলা কাটার নামে লালুর মনখানি নরম হয়ে পড়ল। একটা ঝাঁকড়া বট গাছের তলে দাঁড়িয়ে বলল, আমার কাছে খুচরা নেই। পাঁচ টাকার নোট আছে।

—দ্যান সায়েব ভাঙ্গিয়ে আনি। আপনি বসেন গিয়ে ঐ মাচানে।

লালু বসে রইল। পাক্কা আধ ঘন্টা বসে থেকেও যখন সে দেখল ছেলেটি ফিরছে না, তখন ওর টনক নড়ল। এক পা দুপা করে এসে দেখল, ছোট্ট একটা দোকান। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, একটা ছেলে পাঁচ টাকার নোট ভাঙ্গাতে আসেনি?

দোকানদার বলল, সে ত অনেকক্ষণ আগে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গেছে।

লালু অবাক হয়ে ভাবল, সাধু তাহলে ভেগেছে?

সন্ধ্যার অল্প আগে একটি ছোট্ট বাজারে পৌঁছল সে। সেদিন হাটবার। একজন হাটুরের সাথে সাথে সে পৌঁছল সেখানে। লালুর কাছে খান সেনাদের দুরাবস্থার খবর শুনে সে খুশী হয়ে বলল, তার এক মামাতো ভাই গোপনে মুক্তিদের সাহায্য করে কিন্তু প্রকাশ্যে পীস্ কমিটির সদস্য। রাজশাহী যাবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে সে একটি আইডেন্টিটি কার্ড নিয়ে দেবে লালুকে।

হাটে পৌঁছেই পাওয়া গেল, তার মামাতো ভাইকে। বেশ অনেকগুলি লোক বাজারে জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। লালুর মুখে খবর শুনে কারুর মুখে হাসি ফুটল, আবার কারুর মুখ গেল শুকিয়ে। লালুর আইডেন্টিটি কার্ড আর লাগল না। শোনা গেল ঐদিন দুপুর থেকে যাতায়াতের সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ মেষ লোকটির মামাতো ভাই-এর বাড়িতে দিন কয়েক থাকতে হল তাকে বাধ্য হয়ে।

প্রথম দিন সন্ধ্যের পর সে লক্ষ্য করল, একটি ছোট্ট রেডিও এক দঙ্গল লোকের আনন্দিত মহফিলটি সহসা একেবারে মাটি করে দিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনে মুহূর্মুহু খুশী হয়ে উঠছিল যারা, তারাই সপ্তম নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে উপস্থিতির কথা শুনে, 'সেরেছে' বলে সমস্বরে চীৎকার করে মুখ কালো করে ফেলল। ব্যাটা আমেরিকা এবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভন্ডুল করতে আসছে। সবার মন খারাপ

www.pathagar.com

হবারই কথা।

রাত পোহালে পাক সেনাদের পরাজয়ের কথা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। সকালের দিকে পলায়নপর সেনাবাহিনী শহর ছেড়ে রেল স্টেশনের দিকে ছুটল। তখনও গাড়ীর সামনে উঁচানো সংগীন। রাস্তায় একটু বেরিয়েছিল লালু। দেখল গাড়ি ভর্তি মিলিটারীদের মধ্যে একজন কোমর দুলিয়ে নাচছে বেদম। শ্রীঘরে যাবার আগে এটা এক বীভৎস মৌজ।

সকাল বেলা বাবুর আলী নামে একজন মানুষের সাথে পথে দেখা। এই দুর্দিনে লালুর উপর কেন যেন মায়া হয়েছে ঐ বাবুর আলীর। মাঝে মাঝে সে তাকে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনে সরিষার মাঠে। এমনি এক চক্কর ঘুরতে যাচ্ছিল দুজন। বড় সড়কের ওপর পৌঁছতেই একখানি রিকসা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে থামল একটু দূরে। তারপরেই ফিরে এলো রিকসাটি। যাত্রিটি নেমে সরাসরি লালুকে জিজ্ঞেস করল, কী করেন এখানে?

লালু জবাব দিল, যুদ্ধে আটকা পড়েছি।

—ও, এই কথা? আচ্ছা আপনার নাম কালু, তাই না?

—জ্বি না।

—আপনি মিথ্যে বলছেন।

—না, আমি মিথ্যে বলছি না।

—তাহলে আপনার নাম কি?

—লাল মোহম্মদ।

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ লালু, লালু। আপনি রাজাকার ছিলেন, তাই না?

ততক্ষণে উৎসুক জনতার দারুণ ভীড় জমে উঠেছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে লালু ফ্যাস ফেসে গলায় জবাব দিল, ছিলাম।

ব্যস, আর যায় কোথা। 'পেয়েছিরে' বলে উল্লসিত জনতার আনন্দ কলরবে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। একজন সবলদেহী মানুষ সামনে এগিয়ে এসে লালুর মুখের ওপর প্রচন্ড একটা ঘুষি মেরে আসল কাজের সূচনা করে দিল। তারপরেই দীর্ঘক্ষণ কিলঘুষি চলল একটানা। তা দেখে আরেক জন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক এসে বাধা দিলেন। এভাবে কিলঘুষি দিয়ে মেরে ফেলাটা তাঁর পছন্দ নয়। তাঁর মতে যথার্থ নিয়ম হচ্ছে ওর নিজ হাতে খোঁড়া গর্তেই ওকে কবর দেয়া। প্রস্তাবটি উপস্থিত জনতার তাৎক্ষনিক অনুমোদন লাভ করল। এবার হৈ হল্লা করে সবাই লালুকে এক বধ্যভূমিতে নিয়ে হাজির করল। ডিসেম্বরের ম্লান সূর্যের ফিকে হলুদ রোদ তখন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া

www.pathagar.com

দেবদারু গাছের পাতায় পাতায় চিক চিক করছে। লালু ঐ দিকে দৃষ্টি মেলে মোহময় দেশটাকে যখন একবার দেখতে গেল, ঠিক তখনই ওর হাতে একখানি কোদাল দেয়া হল। লালু কোদাল হাতে দুমুহূর্ত কী সব ভাবছিল, কিন্তু সহসা বুকের কাছে থ্রি, নট থ্রি-র নির্দয় নলটি দেখতে পেয়ে মাটিতে সে কোপ দিতে লাগল। এক....দুই....তিন। এমনি সময় ভীড় ঠেলে আর একজন তাগড়া জোয়ান লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রায় লালুর পায়ের কাছে। কে? কে? সহস্র প্রশ্ন জাগল চারদিকে।

উত্তর এলো, শালা বিহারী। শালাকে ওর সাথেই কবর দাও। মোচঅলা জোয়ান শালা কোদাল চালাতে পারবে খুব।

জনতার মধ্য থেকে একজন লোক এগিয়ে এসে ওকে ভাল করে দেখে নিল, তারপর বলল, তুম কোন হো? মুঝে লছমনিয়া মা'লুম হোতা? সচ্‌নেহী?

মুখের কথা শেষ না হতেই মোচঅলা এবার হাঁউমাঁউ করে ডুকরে উঠল। বলল, ম্যয় সব আদমী কো বাতায়া বাবু, হম্ লছমনিয়া। লেকিন আদমী লোগ বিসওয়াস নেহী করতা।

লোকটি এবার হাত তুলে বলল, ভাইসব, এ লোকটি শহরের লছমনিয়া জমাদ্দার, বিহারী নয়।

কে যেন প্রশ্ন করল, বিহারীদের মতন কথা আর আপনি বলছেন বিহারী নয়?

—উঁ'হু, লোকটা শহরের মেথর। মুসলমান নয়।

সহসা ভুল বুঝতে পেরে সবার হাত পা এবার নিমেষে বিকল হয়ে গেল। তাকে মুক্ত করে দিয়ে নির্মল স্বস্তি পেল জনতা। আর এদিকে লছমনিয়াও ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এবার সবার লক্ষ্য আবার ফিরে এলো লালুর দিকে। তার কিন্তু মুক্তি পাবার উপায় নেই। কারণ সে মেথর নয়, ডোম নয়, সে মুসলমান। তার মুক্তি অসম্ভব। লালু ততক্ষণে বিধ্বস্ত শরীরে কঠিন মাটির ওপর বহু কষ্টে একটার পর একটা কোপ দিয়ে চলেছে। তাকে ঘেরাও করে উৎফুল্ল জনতা দেশের সুখ শান্তির এই প্রকৃত শত্রুকে সজাগ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে।

লালু কোদাল চালাচ্ছে আর ভাবছে, এই উৎফুল্ল জনতা কার কবর খোঁড়াচ্ছে তাকে দিয়ে?

www.pathagar.com

গত কয়েক বছর ক্রমাগত গল্প–উপন্যাস লিখে জামেদ আলী এখন পরিচিত কথাশিল্পী। তাঁর কথাসাহিত্য সাধারণ মানুষকে নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের সুখ–দুঃখ আনন্দ–বেদনাই সেখানে অংকিত। তাঁর রচনারীতিও সরল, সহজ, অকৃত্রিম। কিন্তু কখনো অসচেতন নয়। একটি দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে– সমাজ–সমালোচনা। আবার এই জাগ্রত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সাহিত্যকে উদ্দেশ্যমূলক ও যান্ত্রিক ক'রে ফ্যালেনি। একটি অকৃত্রিম অযান্ত্রিক প্রবহমান সহজতায় তাঁর গল্প–উপন্যাস সবসময় সুখপাঠ্য।

আবদুল মান্নান সৈয়দ